بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○
وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ○

হাযির-নাযির

[حاضر ناظر]

লেখক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার,
আলমগীর খানকাহ শরীফ ষোলশহর, চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১১৯৯-২২৪৪০৩

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,
E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com
www.anjumantrust.org

হাযির-নাযির

লেখক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার
আলমগীর খানকাহ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল

১ রমযানুল মুবারক, ১৪৩৫ হিজরী
১৫ আষাঢ়, ১৪২১ বাংলা
২৯ জুন, ২০১৪ ইংরেজী

কম্পোজ - সেটিং
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা

HAZIR-NAZIR COMPILATED BY **MOULANA MUHAMMAD ABDUL MANNAN**, DIRECTOR GENERAL, ANJUMAN RESEARCH CENTRE, CHITTAGONG, PUBLISHED BY **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** CHITTAGONG, BANGLADESH. **HADIAH TK. 50**/- ONLY.

সূচীপত্র

ক্র.ম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	মুখবন্ধ	০৪
০২.	‘হাযির-নাযির’-এর আভিধানিক অর্থ	০৬
০৩.	‘হাযির-নাযির’-এর পারিভাষিক অর্থ	০৭
০৪.	দু’টি উদাহরণ	০৭
	প্রথম অধ্যায়	
০৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদঃ** পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে ‘হাযির-নাযির’	১১
০৬.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ** সহীহ্ হাদীস শরীফের আলোকে ‘হাযির-নাযির’	১৮
০৭.	**তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ** উম্মতের ফক্বীহ্ ও বিজ্ঞ আলিমদের অভিমতের আলোকে ‘হাযির-নাযির’	২৬
০৮.	**চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ** বিরুদ্ধবাদীদের কিতাবাদি থেকে ‘হাযির-নাযির’	৩৮
০৯.	**পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ** যৌক্তিক দলীলাদি দ্বারা ‘হাযির-নাযির’	৪১
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
১০.	বিরুদ্ধবাদীদের ৯টি আপত্তি ও সেগুলোর সপ্রমাণ খণ্ডন	৪৪

মুখবন্ধ

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

নাহ্মাদুহূ ওয়ানুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু ‘আলা হাবীবিহিল করীম ওয়া ‘আলা- আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী আজমা‘ঈন

আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর হাবীবকে অগণিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভূষিত করেছেন। ওইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো- তিনি ‘শাহিদ’ বা ‘হাযির-নাযির’। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ ফরমান, ‘ইয়া--- আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইন্না--- আরসালনা-কা শা-হিদা-’। হে নবী, আমি আপনাকে ‘শা-হিদ’ করে প্রেরণ করেছি। ‘শা-হিদ’ মানে ‘সাক্ষী’। বস্তুত সাক্ষী তিনিই হন, যিনি হাযির-নাযির। এভাবে পবিত্র ক্বোরআন ও সহীহ্ হাদীস শরীফ ইত্যাদিতে এর পক্ষে বহু দলীল-প্রমাণ রয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা সুন্নী মতাদর্শের অনুসারীরা ওইসব দলীলের ভিত্তিতে হুযূর-ই আক্রামকে ‘হাযির-নাযির’ মানতে গর্ববোধ করেন; কিন্তু অসুন্নী হতভাগারা হুযূর-ই আক্রামকে ‘হাযির-নাযির’ মানতে নারায বরং বলে বেড়ায় ‘এ গুণটা আল্লাহ তা‘আলারই। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে এ বিশেষণে বিশেষিত করলে শির্ক হবে। ইত্যাদি’; অথচ ‘শাহিদ’ (সাক্ষী)-এর মর্মার্থ এবং ‘হাযির-নাযির’-এর পারিভাষিক অর্থটি গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হলে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও কোন ধরনের ভ্রম থাকার কথা নয়। কারণ কেউ অকুস্থলকে চাক্ষুষভাবে পরিদর্শন না করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। আর খোদ্ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর হাবীবকে কুল কা-ইনাতের জন্য ‘শা-হিদ’ বা সাক্ষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং সব কিছুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী না হলে তিনি ‘শা-হিদ’ কিভাবে? তদুপরি, তিনি হাযির-নাযিরও হন তিনি, যাঁর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান- আপন অবস্থানে রয়ে সমগ্র বিশ্বকে হাতের তালুর মত দেখা, দূর ও নিকটের আওয়াজ-আহ্বান শুনতে পারা এবং শত-সহস্র মাইল দূরে অবস্থানকারীকে সাহায্য করতে পারা; চাই তিনি সশরীরে গিয়ে এসব কাজ করুন কিংবা তাঁর জীবদ্দশায় দাফনের পর মাযার-রওযায় অবস্থান করেই করুন। এ অর্থে যে হুযূর-ই আকরাম এবং অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম ও ওলীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমও ‘হাযির-নাযির’ তার পক্ষে পবিত্র ক্বোরআন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ, বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত, এমনকি বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্নভাবে স্বীকারুক্তি ইত্যাদি প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। এ পুস্তকে এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি, এতে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব, অন্যান্য নবীগণ ও আউলিয়া-ই কেরাম আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে ‘হাযির-নাযির’। ফিক্বহ্ এবং ফাত্ওয়া মতেও এ আক্বীদা সঠিক। তদসঙ্গে এ পুস্তকে বিরুদ্ধবাদীদের এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক জবাবও খণ্ডনসহকারে দেওয়া হয়েছে। একটি ভূমিকা, ও দু’টি অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদে এটা সুবিন্যস্থ হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধবাদীদের সর্বমোট নয়টি আপত্তি ও সেগুলোর খন্ডন প্রমাণ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আশা করি, এ পুস্তিকাটা নিষ্ঠার সাথে পাঠ-পর্যালোচনা করলে বিষয়টা মান্য করার ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক হবে। সুন্নী আক্বীদায় বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে এবং বিরুদ্ধবাদীদের বিবেককে তা মানতে বাধ্য করবে। উল্লেখ্য, ‘দাওয়াত-ই খায়র প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০১৫ইংরেজী’তে, যা চট্টগ্রাম আলমগীর খানকাহ্ শরীফ, ‘আনজুমান রিসার্চ সেন্টার অডিটোরিয়াম’-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমার আলোচনার নির্দ্ধারিত বিষয়বস্তু ছিলো। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাতে আমি বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তৎসঙ্গে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পুস্তকারে প্রণয়নও করেছি, যা এখন প্রকাশিত হলো। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ এটা প্রকাশের প্রশংসিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই এ মহান উদ্যোগকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। আর পুস্তকটা সম্মানিত পাঠক সমাজকে উপকৃত করলে আমাদের সবার উদ্যোগ ও প্রয়াস সার্থক হবে- তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ কবুল করুন! আ-মী-ন।

ইতি-

(মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

হাযির-নাযির

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা রসূলিহিল করীম
ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন

শরীয়তের পরিভাষায়, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা যদি এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র বিশ্বকে আপন হাতের তালুর মতো দেখতে পান এবং দূরের ও কাছের আওয়াজ-আহ্বান শুনতে পান অথবা একই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের ভ্রমণ করতে সক্ষম হন, শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থানরত সাহায্যপ্রার্থী কিংবা সহযোগিতার মুখাপেক্ষী লোকদের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করেন, তিনিই 'হাযির-নাযির'। এ অর্থে, 'হাযির-নাযির' গুণটি আল্লাহর ক্ষমতাদানক্রমে, বিশ্বনবী আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম, এমনকি বুযুর্গানে দ্বীনেরও। এর পক্ষে ক্বোরআন-ই করীম, সহীহ হাদীসসমূহ ও বিজ্ঞ আলিমদের অভিমত ইত্যাদি অকাট্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি রয়েছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর লোক নির্বিচারে বলে বেড়ায়-'হাযির-নাযির' হওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ ও বৈশিষ্ট্য; তাই এ গুণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা 'শির্ক ফিস্ সিফাত' (গুণাবলীতে আল্লাহর সাথে শির্ক করা)'র সামিল; অথচ সর্বত্র সশরীরে 'হাযির-নাযির' হওয়া আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্য হতে পারেনা, কারণ তিনি 'শরীর' থেকে এবং একস্থানে হাযির হয়ে অন্যত্র 'গায়ব' বা অনুপস্থিত হওয়া থেকে পবিত্র। অবশ্য তিনি (আল্লাহ) 'সর্বত্র বিরাজমান'। তা এ অর্থে যে, সর্বত্র তাঁর জ্ঞান (ইল্ম) ও ক্ষমতা বিরাজমান। সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু থেকে আরম্ভ করে অণু-পরমাণু পর্যন্ত কোন সৃষ্টিই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়, সবকিছু সম্পর্কে তিনি স্বত্তাগতভাবে ও সরাসরি অবগত।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- انَّ اللهَ لاَ يَخْفَىْ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فى السَّمَاءِ(নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট কোন কিছু গোপন নয় যমীনে, না আসমানে) আর প্রতিটি সৃষ্টির উপর তাঁর ক্ষমতা বিরাজিত। কোন 'বস্তু'ই তাঁর আওতা বহির্ভূত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- انَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

'হাযির' ও 'নাযির' (حاضر و ناظر) দু'টি আরবী শব্দ। উভয় শব্দের আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপঃ

'হাযির' (حاضر)-এর আভিধানিক অর্থ- যে বা যিনি সামনে উপস্থিতি, অর্থাৎ গায়ব বা অনুপস্থিত নয় বা নন। অভিধানগ্রন্থ 'আল-মিসবাহুল মুনীর'-এ এর ব্যবহার এভাবে দেখানো হয়েছে- حَضَرَ الْمَجْلِسَ اَىْ شَهِدَه অর্থাৎ সে মজলিসে হাযির হয়েছে। حضَرَ الْغَائِبُ حُضُوْرًا قَدِمَ مِنْ غَيْبَتِه অর্থাৎ অনুপস্থিত ব্যক্তি হাযির বা উপস্থিত হয়েছে, সে তার অনুপস্থিতির অবসান ঘটিয়ে (সামনে) এসে গেছে। 'মুন্তাহাল আরব'-এ উল্লেখ করা হয়েছে- حاضر شونده حاضر অর্থাৎ 'হাযির' মানে 'উপস্থিত হয়েছে এমন লোক'।

'নযির' (ناظر)-এর আভিধানিক অর্থ একাধিক- চোখে দেখে এমন লোক (প্রত্যক্ষকারী, অবলোকনকারী), চোখের মণি, দৃষ্টিপাত করা, নাকের রগ, চোখের পানি। 'আল-মিসবাহুল মুনীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَالنَّاظِرُ السَّوَادُ الْاَصْغَرُ مِنَ الْعَيْنِ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ الْاِنْسَانُ شَخْصَه

অর্থাৎ 'নাযির' হচ্ছে চোখের ওই ছোট্ট কাল অংশ, যা দ্বারা মানুষ নিজে দেখে, অর্থাৎ চোখের মণি।

'ক্বামূসুল্ লুগাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

والنَّاظِرُ السَّوَادُ فى الْعَيْنِ اوِ الْبَصَرُ بِنَفْسِه وَعِرْقٌ فِى الْاَنْفِ وَفِيْهِ مَاءُ الْبَصَرِ

অর্থাৎ 'নাযির' হচ্ছে- চোখের কালো অংশ (মণি) অথবা স্বয়ং দেখা, নাকের শিরা (রগ)। তা'তে আরো আছে 'চোখের পানি'।

'মুখ্তারুস্ সিহাহ্'তে ইবনে আবূ বকর রাযী বলেন-

اَلنَّاظِرُ فِى الْمُقْلَةِ السَّوَادُ الْاَصْغَرُ الَّذِىْ فِيْهِ اَنْسَانُ الْعَيْنِ

অর্থাৎ 'নাযির' মানে চোখের মণি, চোখের অভ্যন্তরে ছোট্ট কালো অংশ।

সুতরাং যতদূর পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি কাজ করে ততদূর পর্যন্ত আমরা 'নাযির' (দ্রষ্টা, দৃষ্টিপাতকারী)। আর যে স্থান পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতা চলে ততটুকু স্থানে আমরা 'হাযির'। যেমন- আসমান পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি কাজ করে, আমরা আসমান পর্যন্ত দেখতে পাই। কাজেই, আসমান পর্যন্ত আমরা 'নাযির' 'দ্রষ্টা' বা প্রত্যক্ষকারী); কিন্তু আমরা সেখানে 'হাযির' নই; কারণ, সেখানে আমাদের ক্ষমতা নেই। আর ঘরে কিংবা কামরায় আমরা মওজুদ থাকি, সেখানে আমরা 'হাযির'; কারণ, ওখানে আমরা সশরীরে পৌঁছে গেছি, আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করি।

‘হাযির-নাযির’-এর পারিভাষিক অর্থ

এ বিশ্বে ‘হাযির-নাযির’-এর অর্থ শরীয়তের পরিভাষায় নিম্নরূপ-

“ওই খোদাপ্রদত্ত পবিত্র বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিই ‘হাযির-নাযির’, যিনি এক স্থানে অবস্থান করে সমগ্র বিশ্বকে নিজের হাতের তালুর মতো দেখতে পান, দূর ও নিকটের আওয়াজ-আহ্বান শুনতে পান, এক মুহূর্তে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারেন, শত-সহস্র মাইল কিংবা ক্রোশ দূরে অবস্থানকারীর প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করতে পারেন। তাঁর এ গতি ও নিরেট রূহানী (আত্মিক) হোক কিংবা এ জড় জগতের দেহ সহকারেও হোক, অথবা ওই দেহ সহকারে হোক, যা কবরে দাফন করা হয়েছে অথবা অন্য কোথাও মওজুদ থাকুক।”

উল্লেখ্য যে, এ ‘হাযির-নাযির’ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহক্রমে সম্মানিত নবীগণ এবং ওলীগণেরও। এর সপক্ষে পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ এবং বিজ্ঞ আলিমদের অভিমত অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে পাওয়া যায়। [সূত্র. জা-আল হক্ব ও শানে মোস্তফা বযবানে মোস্তফা ইত্যাদি]

দু’টি উদাহরণ

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ওলীগণ তথা তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যে ‘হাযির-নাযির’- এ বিষয়ের পক্ষে পবিত্র ক্বোরআন, হাদীস ও বিজ্ঞ আলিম-ইমামদের অভিমতগুলো উল্লেখ করার পূর্বে নিম্নে দু’টি সঠিক ও সত্য ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। এ দু’টি ঘটনা আলোচ্য বিষয়টি অনুধাবনে সহায়ক হবে-

এক. ‘ক্বসীদা-ই বোর্দাহ্’ শরীফের রচয়িতা অকৃত্রিম ও অনন্য আশেক্ব-ই রসূলের নাম আজ প্রায় সর্বজন বিদিত। তাঁর রচিত ‘ক্বসীদাহ্ বোর্দাহ্’ শরীফের নামকরণ ও রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও প্রায় সবাই জানেন। এর মহান রচয়িতা হলেন আল্লামা শরফ উদ্দীন মুহাম্মদ বূসীরী মিশরী (৬০৮/১২১৩-৬৯৫/১৩০০)। তিনি আরবীর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানসমুদ্র ছিলেন। আরবী অলংকার শাস্ত্র (ফাসাহাত ও বালাগাত)-এ তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ। আরবী সাহিত্যে ছিলো তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সর্বোপরি, তিনি ছিলেন অকৃত্রিম আশেক্বে রসূল। এক রাতে তিনি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাহাবা-ই কেরামের একটি নূরানী জমা‘আত সহকারে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর থেকে তাঁর মধ্যে নবী করীমের প্রতি ইশক্ব-ভালবাসা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নবীপ্রেমে বিভোর হয়ে তিনি এরপর কয়েকটা ‘ক্বসীদা’ (কাব্য বিশেষ) লিখে

ফেলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ‘ক্বসীদাহ্-ই মুদ্বারিয়াহ্’ ও ‘ক্বসীদাহ-ই হামাযিয়্যাহ্’ তাঁর ওই সময়েরই রচনা।

এরপর তিনি একদিন হঠাৎ পক্ষাঘাত (অর্দ্ধাঙ্গ) রোগে আক্রান্ত হয়ে যান। তাঁর শরীরের অর্দ্ধেকাংশ অনুভূতিহীন হয়ে যায়। এমন কঠিন মুসীবতের সময় তাঁর মনে এ আগ্রহই জাগলো যে, তিনি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় একটি ‘ক্বসীদা’ লিখবেন আর সেটার মাধ্যমে নবী করীমের আরোগ্য-নগরীর দ্বারপ্রান্তে নিজের জন্য আরোগ্য ভিক্ষা চাইবেন। সুতরাং তিনি ওই অবস্থায়ই এ ‘ক্বসীদাহ্ শরীফ’ (ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্ শরীফ) রচনা করেন। বলাবাহুল্য, এ ক্বসীদাহ্ শরীফে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করেছেন অতি উন্নত মানের আরবী কাব্যে। প্রশংসাগুলোও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ভিত্তিক। তৎসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর হাবীবের মহান দরবারে তাঁর রোগমুক্তি ও উভয় জাহানের সাফল্য চেয়েছেন অত্যন্ত কোমল ভাষায়; অতি সংগোপনে।

আলহামদু লিল্লাহ্! আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর হাবীবে করীমের মহান দরবারে তাঁর ক্বসীদাটি ও তাঁর ফরিয়াদ কবুল হয়েছে। ক্বসীদা রচনা সমাপ্ত করে তিনি যথানিয়মে শু’য়ে পড়লেন। ওই রাতেই তাঁর অনন্য সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদিত হলো। তিনি মসীহে কাউনাঈন, শিফা-ই দারাঈন সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হন। তিনি বলেন, “আমি ওই স্বপ্নে আমার রচিত কবিতাখানা হুযূর-ই আক্রামের সামনে পাঠ-আবৃত্তি করেছি। ক্বসীদাটার পাঠ সমাপ্ত করার পরক্ষণে আমি দেখতে পেলাম, সরকার-ই দু’আলম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার অসুস্থ দেহাংশের উপর তাঁর অনুপম নূরী ও বরকতময় হাত বুলাচ্ছেন। ইত্যবসরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ খুলতেই আমি আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ পেলাম।” সুবহা-নাল্লা-হিল ‘আযী-ম।

তাছাড়া, এ ক্বসীদাহ্ শরীফের পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত করার পর হুযূর-ই আক্রাম আপন বরকতময় বুর্দে ইয়ামানী (ইয়ামনী চাদর শরীফ) ইমাম বূসীরীর উপর রাখলেন। আর সাথে সাথে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

[ত্বী-বুল ওয়ার্দাহ্ শরহে ক্বসীদা-ই বোর্দাহ্]

ইমাম বূসীরী আলায়হির রাহ্মাহ্ বলেন, “এ খুশীতে আমি পরদিন ভোর বেলায় আমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। পথিমধ্যে শায়খ আবুর রাজা সিদ্দীক্ব

(আলায়হির রাহমাহ্)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি ওই যুগের ক্বুত্বুল আক্বত্বাব ছিলেন। তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, "হে ইমাম, আমাকে ওই ক্বসীদা পড়ে শুনান, যা আপনি হুযূর-ই আক্রামের প্রশংসায় লিখেছেন।" ইমাম বূসীরী বলেন, যেহেতু এ ক্বসীদা শরীফ সম্পর্কে আমি ব্যতীত তখনও অন্য কেউ অবগত হয়নি, সেহেতু আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, "হযরত, আপনি কোন ক্বসীদাহ্ চাচ্ছেন। আমি তো হুযূর-ই আক্রামের শানে একাধিক ক্বসীদা রচনা করেছি।" শায়খ আবুর রাজা বললেন, ওই ক্বসীদাহ্ শুনান, যার প্রারম্ভ এভাবে করেছেন-

اَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمٍ - مَزَجْتَ دَمْعًا جَرٰى مِنْ مُّقْلَةٍ بِدَمٍ

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, "হে আবুর রাজা, আপনি এ ক্বসীদা কোত্থেকে মুখস্থ করলেন? আমি এ ক্বসীদা আমার আক্বা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এ পর্যন্ত অন্য কাউকে শুনাইনি!" হযরত আবুর রাজা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বললেন, "হে বূসীরী, আমি গতরাতে এ ক্বসীদা তখনই শুনেছি, যখন আপনি সেটা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনাচ্ছিলেন। আর হুযূর-ই আক্রামও তা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।" একথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে এ ক্বসীদা দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে গোটা শহরে সেটার খবর প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। আর আজ তো এ ক্বসীদার চর্চা বিশ্বজোড়া।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম বূসীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তখন অবস্থান করছিলেন মিশরে আর আল্লাহ্র হাবীব তাশরীফ রাখছিলেন মদীনা মুনাওয়ারায়, রওযা-ই আন্ওয়ারে। এ ঘটনাও ঘটেছে হুযূর-ই আক্বদাসের ওফাত শরীফের প্রায় ৬০০ বছর পর। ইমাম বূসীরী এ ক্বসীদা রচনা করেছেন ও সেটার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনাও করেছেন অতি সংগোপনে, তাঁর বদ্ধ কামরায়। আর তৎক্ষণাৎ এ ফরিয়াদ সম্পর্কে জেনে ও শুনে হুযূর-ই আক্রাম মদীনা শরীফ থেকে সুদূর মিশরে তাশরীফ আনয়ন করে তাঁকে হাত মুবারক বুলিয়ে দিয়ে সুস্থ করেছেন এবং চাদর শরীফ দান করেছেন। সুবহা-নাল্লাহ। এটাইতো বিশ্বনবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর 'হাযির-নাযির' হবার এক অকাট্য প্রমাণ।

[সূত্র: ত্বীবুল ওয়ার্দ্দাহ্ শরহে ক্বসীদাহ্-ই বোর্দাহ্]

***

দুই. হযরত শায়খ আবদুল হক্ব হারীমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন- ৩ সফর, ৫৫৫ হিজরী। আমরা হুযূর গাউসুল আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র মাদরাসায় হাযির ছিলাম। আমরা স্বচক্ষে দেখছিলাম যে, হযরত গাউসে আ'যম ওযূ করছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাঁর বরকতময় পদযুগলের গীলানী খড়ম দু'টি একের পর এক করে বাতাসে নিক্ষেপ করলেন। অমনি ওই খড়ম যুগলও বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কারো সাহস হলোনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার। সবাই নিশ্চুপ ছিলাম। এর ২৩ দিন পর অনারবীয় অঞ্চল থেকে একটি কাফেলা আসলো। তারা এসে হুযূর গাউসে পাকের মহান দরবারে তাঁর খড়ম দু'টি আর কিছু 'নযর-নেয়ায' পেশ করলো। আর আরয করলো, "আমরা এক পাহাড়ী পথ অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ ডাকাতদল আমাদের উপর হামলা করে দিলো। আমাদের কয়েকজন লোক তাদের হাতে নিহত হলো। ডাকাতগণ আমাদের কাফেলার মাল-সামগ্রী লুণ্ঠন করতে লাগলো। আমরা যখন তাদের হামলা প্রতিহত করতে অক্ষম হয়ে গেলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকে উচ্চস্বরে আহ্বান করলাম, اَغِثْنِىْ يَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرْ (হে শায়খ আবদুল ক্বাদির, আমাকে সাহায্য করুন) আর কিছু মান্নত করে নিলাম। এর পরক্ষণে ওই অরণ্যে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেলো, সেটার গর্জনে সমগ্র অরণ্য যেন কেঁপে উঠলো। তখন এ একটা খড়ম শরীফ ডাকাত-সর্দারের মাথার উপর এসে পড়লো। সেটার আঘাতের চোটে সর্দার মারা গেলো। এরপর অপর খড়মটি আরেক বড় ডাকাতের মাথায় পড়লো। সেও মারা গেলো। এটা দেখে পূর্ণ ডাকাত দলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। সুতরাং তারা আমাদের সমস্ত মালামাল ফেলে পালিয়ে গেলো। আমরা খড়ম যুগল দেখে চিনে ফেলেছি। এগুলো তো গীলান শহরের বরকতমণ্ডিত খড়ম। সুতরাং আমরা খড়ম দু'টি সযত্নে কুঁড়িয়ে নিয়ে আমাদের নিকট সংরক্ষণ করলাম, আর মান্নত অনুসারে হাদিয়া এবং ওই খড়মযুগল নিয়ে মহান দরবারে হাযির হয়েছি।"

[সূত্র. বাহজাতুল আসরার]

এখানেও লক্ষণীয় যে, হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাগদাদ শরীফে আপন মাদরাসায় সদয় অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে অনেক দূরে অনারবীয় অঞ্চলের গভীর অরণ্যে বিপদগ্রস্ত ব্যবসায়ী কাফেলা তাঁর সাহায্য চেয়ে আহ্বান করলো। এদিকে হুযূর গাউসে পাক তাদের ফরিয়াদ শুনেছেন। আর ঘটনাস্থল দেখে দেখে খড়ম যুগল যথাস্থানে নিক্ষেপ করেছেন। কাঠের খড়ম উড়ে গিয়ে ডাকাতদ্বয়কে এমন জোরে আঘাত করলো যে, চোটে তারা নিহত হলো। এ নির্ভুল ঘটনাও ওলীকুল শিরমণি হুযূর গাউসে পাকের 'হাযির-নাযির' হবার পক্ষে আরেক অকাট্য প্রমাণ হলো। সুবহা-নাল্লাহ্।

এখন দেখুন- নবী ও ওলীগণ 'হাযির-নাযির' মর্মে পবিত্র ক্বোরআন, হাদীস শরীফ এবং ইমাম ও বিজ্ঞ ওলামার অভিমতসমূহ থেকে প্রণিধানযোগ্য দলীলাদি। তারপর বিরুদ্ধবাদীদের লেখনী ও বক্তব্য থেকে এর সপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণাদির উদ্ধৃতি আর পরিশেষে বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন। সুতরাং এ প্রস্তক দু'টি অধ্যায়ে বিন্যস্থ করা হলো, প্রথম অধ্যায়ে আবার পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধবাদীদের নয়টি আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে।

---o---

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে ‘হাযির-নাযির’

।। এক ।।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (٤٦)

তরজমা: ৪৫. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী), নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ‘হাযির-নাযির’ করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। ৪৬. এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী আর আলোকজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে।

[সূরা আহযাব: আয়াত ৪৫-৪৬, তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

তরজমা: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ‘হাযির-নাযির’ (উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী) এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে।

[সূরা ফাত্‌হ: আয়াত: ৮ তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

إِنَّآ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥)

তরজমা: নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের উপর হাযির-নাযির; যেভাবে আমি ফির‘আউনের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি। [সূরা মুয্‌যাম্মিল: আয়াত-১৫, কান্‌যুল ঈমান]

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)

তরজমা: তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো? হে মাহ্‌বূব, আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারীরূপে উপস্থিত করবো? [সূরা নিসা: আয়াত-৪১, তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

তরজমা: এবং কথা হলো এযে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। আর এ রসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৪৩, তরজমা-কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াতগুলোর মধ্যে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তা হচ্ছে- ক্বিয়ামতের দিন অন্যান্য সম্মানিত নবীগণের উম্মতরা আরয করবে, “হে আল্লাহ, আমাদের নিকট তোমার নবীগণ তোমার বিধানাবলী পৌঁছাননি।” সম্মানিত নবীগণ আরয করবেন, “আমরা বিধানাবলী পৌঁছিয়েছি।” আর তাঁরা তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য হুযূর মোস্তফা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর উম্মতকে পেশ করবেন। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যদানের বিপক্ষে ওইসব লোক আপত্তি করবে। আর বলবে, “তোমরা তো ওইসব পয়গাম্বরের যমানা পাওনি। তোমরা ‘না দেখে’ কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছো?” তারা বলবে, “আমাদেরকে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।” তখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তিনি দু’টি সাক্ষ্য দেবেনঃ একটি হবে-“নবীগণ বিধানাবলী পৌঁছিয়েছেন।” আর দ্বিতীয়টি হবে- “আমার উম্মতগণ সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য। তারা যা সাক্ষ্য দিচ্ছে তা সঠিক।” মুকাদ্দমা এখানে খতম। ডিক্রী সম্মানিত নবীগণের পক্ষে দেওয়া হবে। যদি হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর দ্বীন-প্রচার আর পরবর্তীতে আপন উম্মতের অবস্থাদি আপন মুবারক চক্ষুদ্বয় দ্বারা না দেখতেন, তাহলে তাঁর সাক্ষ্যদানের বিপক্ষে আপত্তি হবেনা কেন? যেভাবে তাঁর উম্মতের সাক্ষ্যের বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হবে। বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্‌রামের এ সাক্ষ্য ছিলো তাঁর স্বচক্ষে দেখা; আর ইতোপূর্বেকার সাক্ষ্য ছিলো শোনা। এ’তো তিনি যে ‘হাযির-নাযির’ তা প্রমাণিত হলো।

।। দুই ।।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨)

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

[সূরা তাওবা: আয়াত-১২৮, তরজমা: কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফ থেকে তিনভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'হাযির-নাযির' হওয়া প্রমাণিত হয়ঃ

এক. جَآءَ كُمْ (তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন)-এর মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে- 'তোমাদের সবার নিকট হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম তাশরীফ এনেছেন।' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম প্রত্যেক মুসলমানের নিকট রয়েছেন। আর মুসলমানতো বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় রয়েছেন। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামও প্রতিটি স্থানে মওজুদ রয়েছেন।

দুই. এরশাদ হয়েছে- مِنْ اَنْفُسِكُمْ (তোমাদের মধ্য থেকে)। অর্থাৎ তাঁর তাশরীফ আনা তোমাদের মধ্যে তেমনি, যেমন দেহের মধ্যে প্রাণ আসা। অর্থাৎ প্রাণ দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরায়, প্রতি লোমকূপে মওজুদ রয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল থাকে। অনুরূপ, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম মুসলমানের প্রতিটি কর্মসম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। কবি বলেন-

انکھوں میں ہیں لیکن مثل نظر دل میں ہیں جیسے جسم میں جان
ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے

অর্থাৎ তিনি (আমার) চক্ষুযুগলে রয়েছেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির মতো হৃদয়েও রয়েছেন, যেমনিভাবে দেহের মধ্যে প্রাণ রয়েছে।

তিনি আমার মধ্যে রয়েছেন; কিন্তু রয়েছেন গোপন। এটাই হলো তাঁর এমন শানের জ্যোতির প্রকাশ বা প্রদর্শনী।

যদি আয়াতের নিছক এ অর্থই হতো যে, 'তিনি তোমাদের মধ্য থেকে একজন নিছক মানুষই, তাহলে এখানে শুধু مِنْكُمْ (তোমাদের থেকে) বলা যথেষ্ট হতো; مِنْ اَنْفُسِكُمْ (তোমাদের প্রাণগুলো থেকে) কেন এরশাদ হলো?

তিন. এরশাদ হয়েছে عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (তোমাদের কষ্টে পড়া তাঁর জন্য কষ্টকর)। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আমাদের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশার খবর সব সময় হুযূর-ই আক্রামের রয়েছে। এ কারণেই তো আমাদের কষ্টে পড়ার কারণে তিনি আপন হৃদয় মুবারকে দুঃখ অনুভব করেন।

অন্যথায়, আমাদের সুখ-দুঃখের খবর না থাকলে তাঁর দুঃখিত হওয়া কীভাবে? এ বাক্য শরীফও বাস্তবিক পক্ষে مِنْ اَنْفُسِكُمْ - এরই বর্ণনা। যেভাবে দেহের কোথাও ব্যথা পেলে রূহ (আত্মা) কষ্ট পায়, তেমনি তোমরা দুঃখ পেলে মহান

মুনিবও ব্যথিত হন। তাঁর দয়া ও বদান্যতার উপর উৎসর্গ হই! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

।। তিন ।।

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوآ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (٦٤)

তরজমা: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুল্ম করে, তখন হে মাহবূব, (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়; অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে। [সূরা নিসা: আয়াত-৬৪]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, গুনাহ্গারদের ক্ষমার পথ শুধু এযে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে সুপারিশ চাইবে, আর হুযূর-ই আক্রামও দয়া করে সুপারিশ করবেন। বস্তুতঃ এ অর্থ তো হতে পারে না যে, মদীনা-ই পাকে হাযির হতেই হবে। তা যদি হয়, তবে আমরা দরিদ্র ভিন্ দেশী গুনাহ্গারদের মাগফিরাত প্রাপ্তির উপায় কি? ধনীরা হয়তো গোটা জীবনে দু'/একবার সেখানে উপস্থিত হতে পারেন। আর সবাই গুনাহ্ তো রাত দিন করছে। এমতাবস্থায়, (প্রত্যেক গুনাহ্গার মু'মিনকে গুনাহ্র মাগফিরাত-প্রাপ্তির জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হবার নির্দেশ দেওয়া হলে) تَكْلِيْفَ مَا فَوْقَ الطَّاقَةَ (সাধ্যাতীত কষ্ট দেওয়া) অনিবার্য হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। তিনি এরশাদ করেন- لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

তরজমা: আল্লাহ্ কোন আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না, কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-২৮৬, কান্যুল ঈমান]

সুতরাং মমার্থ এ দাঁড়ালো, তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকটে আছেন, তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছোনা। যেন তোমরা অনুপস্থিত রয়েছো। কাজেই, তোমরা হাযির হয়ে যাও, অর্থাৎ তোমরা তাঁর দিকে মনোনিবেশ করো। কবি বলেন-

یار نزدیک تراز من بمن است-دیں عجب بیں کہ من از وے دورم

অর্থাৎ বন্ধু আমার সাথে আছে, আমার নিকটেই আছে। এখানে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমি যেন তাঁর নিকটে নই, বরং দূরে অবস্থান করছি।

বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্‌রাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রতিটি স্থানে হাযির আছেন। যে কোন স্থান থেকে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে।

।। চার ।।

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

তরজমা: আমি আপনাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া: আয়াত-১০৭, কান্‌যুল ঈমান]

আরো এরশাদ ফরমান- وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

তরজমা: আর আমার দয়া (রহমত) প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে। [সূরা আ'রাফ: আয়াত-১৫৬, কান্‌যুল ঈমান]

বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাম সমস্ত জাহানের জন্য রহমত। আর 'রহমত' জগতগুলোকে ঘিরে আছে। সুতরাং হুযূর আলায়হিস্ সালাম জগতগুলোকে ঘিরে আছেন।

স্মর্তব্য যে, মহান রবের শান হচ্ছে- তিনি 'রব্বুল আলামীন' (সমস্ত জগতের রব, প্রতিপালক) আর তাঁর হাবীবের শান হচ্ছে- তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (সমস্ত জগতের জন্য রহমত)।

।। পাঁচ ।।

مَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

তরজমা: এবং আল্লাহ্‌র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত, হে মাহবূব, আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন। [সূরা আন্‌ফাল: আয়াত-৩৩, কান্‌যুল ঈমান]

অর্থাৎ আল্লাহর আযাব এ জন্য আসছেনা যে, তাদের মধ্যে আপনি আছেন। আম আযাব (ব্যাপক শাস্তি) ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোথাও আসবেনা।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বত্র মওজূদ রয়েছেন; বরং 'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রতিটি সৌভাগ্যবান ও হতভাগার সাথে আছেন। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللهِ

তরজমা: এবং জেনে রেখো যে, তোমরাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছেন। [সূরা হুজরাত, আয়াত-৭]

এ'তে সমস্ত সম্মানিত সাহাবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। সাহাবা-ই কেরাম তো বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। বুঝা গেলো যে, হুযূর সর্বত্র তাঁদের নিকটেই আছেন।

।। ছয় ।।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তরজমা: এবং এভাবে আমি ইব্‌রাহীমকে দেখাচ্ছি আসমানসমূহ ও যমীনের সমগ্র বাদশাহী। [সূরা আন্'আম: আয়াত-৭৫, কান্‌যুল ঈমান]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালামকে মহান রব সমগ্র বিশ্বকে কপালের চোখে দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মর্যাদা তদপেক্ষা বেশী। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, তিনিও সমস্ত বিশ্ব দেখে নিয়েছেন।

।। সাত ।।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)

তরজমা: হে মাহবূব! আপনি কি দেখেন নি আপনার রব ওই হস্তি-আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন? [সূরা ফীল: আয়াত-১, কান্‌যুল ঈমান]

।। আট ।।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

তরজমা: আপনি কি দেখেন নি আপনার রব 'আদ গোত্রের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেছেন? [সূরা ফাজ্‌র: আয়াত-৬, কান্‌যুল ঈমান]

'আদ্ সম্প্রদায় ও 'আসহাব-ই ফীল' (হস্তিবাহিনী)'র ঘটনা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত (জন্ম) শরীফের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো; অথচ এরশাদ হচ্ছে- 'আলাম তারা'? আপনি কি দেখেননি? অর্থাৎ 'আপনি দেখেছেন।'

যদি কেউ আপত্তির সুরে বলে, ক্বোরআন-ই করীমে কাফিরদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١)

তরজমা: তারা কি দেখেনি আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি? তারা এখন তাদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী নয়। [সূরা ইয়াসীন: আয়াত-৩১, কান্‌যুল ঈমান]

কাফিরগণ তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে দেখেনি; অথচ এরশাদ হয়েছে তারা কি দেখেনি? তখন এর জবাব হবে- এ আয়াত শরীফে ওইসব কাফিরের উজাড় হওয়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়িগুলো দেখা উদ্দেশ্য। আর যেহেতু মক্কার কাফিরগণ তাদের সফরগুলোতে ওইসব ঘরবাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলো, সেহেতু এরশাদ হয়েছে, 'এসব লোক এসব জিনিষ দেখে কেন শিক্ষা গ্রহণ করছেনা?'

হুযূর-ই আক্‌রাম নাতো প্রকাশ্যভাবে দুনিয়ায় ভ্রমণ করেছেন, না 'আদ সম্প্রদায়ের উজাড় হওয়া দেশগুলোকে প্রকাশ্যে পরিদর্শন করেছেন, এ জন্য এ অর্থ ধরে নিতে হবে যে, তিনি নুবূয়তের নূর দ্বারা দেখেছেন। এখানে উদ্দেশ্যও এটাই।

।। নয় ।।

ক্বোরআন-ই করীমে বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে- وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ (এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন... [সূরা বাক্বারা: আয়াত-৩০] وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ (এবং স্মরণ করুন, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো...। [সূরা বাক্বারা: আয়াত ৫৪] ইত্যাদি।

মুফাস্‌সিরগণ বলেন যে, এসব স্থানে اُذْكُرْ (আপনি স্মরণ করুন) ক্রিয়াপদটি উহ্য বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ হে হাবীব, আপনি ওই ঘটনা স্মরণ করুন। বস্তুত: ওই জিনিষ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যা পূর্বে দেখেছে, কিন্তু ওই দিকে এখন মনোনিবেশ করা হচ্ছেনা। এ থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী এসব ঘটনা হুযূর-ই আক্‌রামের স্বচক্ষে দেখা। 'তাফসীর-ই রুহুল বয়ান'-এ আছে যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সমস্ত ঘটনা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলেন।

এখন যদি আপত্তির ভাষায় বলে, বনী ইসরাঈলকেও বলা হয়েছে- وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ (ওই সময়কেও স্মরণ করো যখন তোমাদেরকে ফির'আউনীদের থেকে নাজাত দিয়েছি...। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-৪৯]

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর যমানার ইহুদীগণ ওই যুগে তো ছিলোনা; অথচ তাফসীরকারকগণ এখানেও اُذْكُرُوْا (তোমরা স্মরণ করো) উহ্য রয়েছে বলে ধরে নেন। এর জবাব হচ্ছে ওই বনী ইসরাঈল ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলো। তারা ইতিহাসের গ্রন্থ-পুস্তক পড়েছিলো। কাজেই, এ আয়াতে ওই দিকে তাদের মনোনিবেশ করানো হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো না কারো নিকট পড়েছেন, না ইতিহাস-গ্রন্থাবলী পাঠ-পর্যালোচনা করেছেন, না কোন ইতিহাসবিদের সঙ্গে ছিলেন, না কোন শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে তিনি লালিত হয়েছেন। সুতরাং নবূয়তের নূর ব্যতীত তাঁর এ অদৃশ্য জ্ঞানের অন্য মাধ্যম কি ছিলো? (অর্থাৎ ছিলো না।)

।। দশ ।।

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

তরজমা: এ নবী মুসলমানদের, তাদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশী নিকটে।

[সূরা আহযাব: আয়াত-৬]

মৌং ক্বাসেম নানূতভী, দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, তার লিখিত 'তাহযীরুন নাস', পৃ. ১০-এ লিখেছেন- এ আয়াতে 'আওলা' মানে অতি নিকটে। সুতরাং

আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো- 'নবী মুসলমানদের, তাদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশী নিকটে, সর্বাধিক নিকটে।' আমাদের প্রাণ আমাদের নিকটে, আর প্রাণের চেয়েও বেশি নিকটে হচ্ছেন আমাদের নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। বস্তুত: অধিক নিকটস্থ বস্তুও গোপন থাকে, এ নৈকট্য বেশী হবার কারণে চোখে দেখা যায়না।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সহীহ্ হাদীস শরীফের আলোকে 'হাযির-নাযির'

হাদীস শরীফ-১

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اِنَّ اللهَ رَفَعَ لِىَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার সামনে সমগ্র দুনিয়াকে পেশ করে দিয়েছেন। অতঃপর আমি এ দুনিয়াকে এবং তাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পয়দা হবে এমন সবকিছুকে তেমনিভাবে দেখছি, যেমন আমি আমার হাতের এ তালুকে দেখতে পাচ্ছি। [শরহে মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ্: কৃত. আল্লামা যারক্বানী আলায়হির রাহমাহ্]

হাদীস শরীফ -২

ইমাম তিরমিযীর সূত্রে বর্ণিত, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

فَتَجَلّٰى لِىْ كُلُّ شَىْءٍ وَعَرَفْتُ

অর্থাৎ অতঃপর আমার সামনে সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে এবং আমি চিনতে পেরেছি। [মিশকাত: বাবুল মাসাজিদ]

হাদীস শরীফ -৩

'তাফসীর-ই খাযিন'-এ আয়াত مَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ - -এর তাফসীরে নিম্নলিখিত হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ اُمَّتِيْ فِيْ صُوَرِهَا فِي الطِّيْنِ كَمَا عُرِضَتْ عَلَى اٰدَمَ وَاُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِيْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِيْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْمُنَافِقِيْنَ قَالُوْا اِسْتِهْزَاءً زَعَمَ مُحَمَّدٌ اَنَّه يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِه وَمَنْ يَّكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يُّخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَه وَمَا يَعْرِفُنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهُ وَاثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ طَعَنُوْا فِيْ عِلْمِيْ لاَ تَسْئَلُوْنِّيْ عَنْ شَيْءٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ اِلاَّ اَنْبَئْتُكُمْ -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সামনে আমার উম্মতকে পেশ করা হয়েছে তাদের আপন আপন আকৃতিতে, মাটিতে, যেভাবে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে- কে আমার উপর ঈমান আনবে, আর কে কুফর করবে। এ খবর মুনাফিক্বদের নিকট পৌঁছালো। তখন তারা ঠাট্টা করে বলতে লাগলো, 'হুযূর (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম) বলছেন, ওইসব লোকের জন্মের পূর্বেই কাফির ও মু'মিনের খবর তিনি পেয়ে গেছেন, অথচ আমরা তাঁর সাথে আছি। তিনি আমাদেরকে চিনেন না।' এ সংবাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেলেন। অতঃপর তিনি মিম্বর শরীফের উপর দণ্ডায়মান হলেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "সম্প্রদায়গুলোর এ কী অবস্থা যে, আমার জ্ঞান নিয়ে তিরস্কার করছে? এ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সবকিছু সম্পর্কে, তোমারা আমাকে যে প্রশ্নই করবে, আমি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে বলে দেবো।"

এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেলোঃ

এক. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞান নিয়ে তিরস্কার করা মুনাফিক্বদের কাজ (প্রথা) এবং

দুই. ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘঠিত হবে এমন সব ঘটনাই হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর জ্ঞানে রয়েছে।

হাদীস শরীফ -৪

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنِّيْ لَاَعْرِفُ اَسْمَآءَ هُمْ وَاَسْمَآءَ اٰبَآءِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ خَيْرُ فَوَارِسَ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ -

অর্থাৎ ওই (দাজ্জালদের সাথে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারীদের) নাম, তাদের পিতার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কে আমি উত্তমরূপে জানি। তারা সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে উত্তম অশ্বারোহী।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, ক্বিয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে সংঘঠিত হবে এমন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কেও হুযূর অতি উত্তমরূপে অবগত আছেন। 'হাযির-নাযির'-এর অর্থ এ থেকেও স্পষ্ট হয়।

হাদীস শরীফ -৫

فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ

অর্থাৎ মুন্কার ও নকীর (ফেরেশতাদ্বয়) বলেন, "তুমি এ মহান ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কি বলতে?"

[মিশকাত শরীফ: বাবু ইস্বাতে 'আযা-বিল ক্বর]

এক. 'আশি''আতুল লুম্'আত'-এ এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'এ মহান ব্যক্তি' দ্বারা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

'আশি''আতুল লুম'আত'-এ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, হয়তো, (প্রত্যেকের) কবরে প্রকাশ্যভাবে হুযূর-ই আক্রামের যাত শরীফকে (অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রামকে সশরীরে) হাযির করেন। তাও এভাবে যে, কবরে স্বয়ং হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সত্তা মুবারককে হাযির করেন। বস্তুত: ওখানে, যাঁরা হুযূর-ই আক্রামের সাক্ষাতের প্রতি অধীর আগ্রহে চিন্তামগ্ন থাকেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ যদি সাক্ষাৎরূপী খুশী হাসিলের আশায় (ওই আশিক্ব) প্রাণও বিসর্জন দেয় এবং জীবিত কবরে চলে যান, তবুও সেটা যথার্থ হবে। (এমনটি করার এটা উপযুক্ত স্থান।)

'মিশকাত শরীফের' হাশিয়া (পার্শ্ব টীকা)য় এ হাদীস শরফের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে- قِيْلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ

অর্থাৎ কেউ কেউ বলেছেন, (তখন) মৃত ব্যক্তির চোখের সামনে থেকে হিজাব (পর্দা) উঠিয়ে ফেলা হয়। ফলে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়। বস্তুত: এটা একটা মহা সুসংবাদই।

দুই. ইমাম ক্বাস্তলানী তাঁর লিখিত 'শরহে বোখারী: তৃতীয় খণ্ড: পৃ. ৩৯০ঃ জানাযা পর্ব'-এ লিখেছেন-

فَقِيْلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِىَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ صَحَّ

অর্থাৎ কেউ কেউ বলেছেন, মৃতের সামনে থেকে হিজাব (অন্তরাল) তুলে দেওয়া হয়। ফলে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পায়। আর এটা মুসলমানের জন্য মহা সুসংবাদ, সে যদি ঠিক থাকে।

কেউ কেউ বলেন, هٰذَا الرَّجُلُ(এ মহান ব্যক্তি)-এর মধ্যে الف ولام - عَهْدِ ذِهْنِىْ (মৃত ব্যক্তির অন্তরে উপস্থিত মহান ব্যক্তি)'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা (মুনকার ও নকীর) বলেন, "ওই মহান ব্যক্তি, যিনি তোমার স্মৃতিপটে রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে?"

কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা, যদি এমনটি হতো, তাহলে কাফির মৃতকে এ প্রশ্ন করা হতো না। কেননা, তাদের অন্তর বা স্মৃতিপটে তো হুযূর-ই আক্রামের কল্পনাও নেই। অনুরূপ, কাফির তাদের জবাবে একথা বলতো না, "আমি তো জানিনা;" বরং একথা বলতো, "আপনারা কার সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন?" তার لَا اَدْرِىْ (আমি জানিনা) বলা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, সে হুযূর-ই আক্রামকে স্বচক্ষে দেখতে পায়; কিন্তু চিনতে পারে না। সুতরাং هذا (এ-ই) দ্বারা প্রকাশ্যভাবে যিনি উপস্থিত রয়েছেন, তাঁর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (عهد خارجى)। এ হাদীস শরীফ ও বচনগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কবরে হুযূর-ই আক্রামের দীদার করিয়ে প্রশ্নটি করা হয়। অর্থাৎ এভাবে বলা হয় এ 'শামসুদ্দোহা' 'বদ্রুদ্দুজা' (যথাক্রমে, মধ্যাহ্ন সূর্য ও ঘন অন্ধকার রাতের পূর্ণিমা চাঁদ) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, যিনি তোমার সামনে সদা উপস্থিত আছেন, তুমি কী বলতে?

তদুপরি, এখানে هٰذَا (হা-যা) اشاره قريب বা নিকটবর্তীর দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বুঝা গেলো যে, দেখিয়ে, নিকটে এনে এ প্রশ্ন করা হয়। এ কারণে, সম্মানিত সূফীগণ ও আশেক্বে রসূলবৃন্দ মৃত্যুর আরজু করেন।

উল্লেখ্য, কবরের প্রথম রাতকে 'দুল্হার সাথে সাক্ষাতের রাত' বলা হয়। আ'লা হযরত আলায়হির রাহমাহ্ বলেন-

جان تو جاتے ہی جائیگی قیامت یہ ہے - کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا

অর্থাৎ প্রাণ তো (একদিন) অবশ্যই দেহ থেকে বের হয়ে যাবেই; কিন্তু এখানে ক্বিয়ামত বা বড় কথা হচ্ছে- এখানে মৃত্যুবরণ করতেই এয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে!

এ কারণে, বুযুর্গানে দ্বীনের ওফাত শরীফের দিনকে 'ওরসের দিন' বলা হয়। 'ওরস' সামনে 'শাদী' (মহাখুশী)। কেননা, এটা আরূস (عروس) অর্থাৎ মহান দুল্হা হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার (সাক্ষাৎ)-এর দিন।

আর এক সময়ে হাজারো মৃতকে দাফন করা হয়। সুতরাং যদি হুযূর-ই আক্রাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম 'হাযির-নাযির' না হন, তাহলে সর্বত্র হাযির হন কীভাবে? বুঝা গেলো যে, 'হিজাব' (অন্তরাল) আমাদের চোখের উপর। ফেরেশতাগণ এ হিজাব তুলে ফেলেন। যেমন, দিনের বেলায় কেউ তাঁবুর মধ্যে বসে রইলো। কেউ তার উপর থেকে তাঁবুটি তুলে ফেলে তাকে সূর্য দেখিয়ে দিলো।

হাদীস শরীফ-৬

মিশকাত শরীফের 'রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করার প্রতি উৎসাহ্ প্রদান' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-

اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَآئِنِ وَمَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ -

অর্থাৎ এক রাতে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আতঙ্কিত অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তিনি এরশাদ করছিলেন, 'আল্লাহরই পবিত্রতা! এ রাতে কী পরিমাণ ভাণ্ডার এবং কী পরিমাণ ফিৎনা অবতীর্ণ হয়েছে!'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ফিৎনাগুলোকেও হুযূর-ই আক্রাম স্বচক্ষে অবলোকন করছেন।

হাদীস শরীফ-৭

'মিশকাত শরীফ' 'মু'জিযাদির বর্ণনা' শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ خَبَرُ هُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ (اِلى) حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللهِ يَعْنِىْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ -

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হযরত যায়দ, হযরত জা'ফর ও হযরত ইবনে রাওয়াহাহ্, তাঁদের সম্পর্কে খবর আসার পূর্বে শাহাদতের খবর লোকজনকে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখন ঝাণ্ডা যায়দ নিয়েছে। আর সে শহীদ হয়ে গেছে।... এ পর্যন্ত যে, ঝাণ্ডা আল্লাহর তরবারি অর্থাৎ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ হাতে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দিয়ে দিয়েছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূ'তাহ্ মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে অনেক দূরে। ওখানে যা কিছু ঘটছিলো, সবই হুযূর-ই আক্রাম মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে দেখছিলেন।

হাদীস শরীফ-৮

মিশকাত শরীফ: ২য় খণ্ড 'কারামত' শীর্ষক অধ্যায়ের পর 'ওফাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত- وَاِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِىْ مَقَامِىْ অর্থাৎ তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে 'হাউযে কাউসার'। আমি সেটা এ স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি।

ছয়. 'মিশকাত বাবু তাস্ভিয়াতিস্ সাফ'-এ বর্ণিত, হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ ফরমান- اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَآئِىْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সফগুলোকে সোজা রাখো। কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখি।

হাদীস শরীফ-৯

তিরমিযী শরীফ: দ্বিতীয় খণ্ড: ইল্ম পর্ব: ইল্ম চলে যাবার বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত-

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَشَخَصَ بِبَصَرِه اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا اَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلٰى شَىْءٍ

অর্থাৎ আমরা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি আপন দৃষ্টি আসমানের দিকে উঠালেন আর এরশাদ করলেন, এটা হচ্ছে ওই সময়, যখন 'ইল্ম' লোকজন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে; এমনকি তোমরা সেটার কিছুই একেবারে আয়ত্ব করতে পারবেনা।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর 'মিরকাত'-এর 'কিতাবুল ইল্ম' (জ্ঞান পর্ব)-এ বলেছেন-

فَكَاَنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ اِلَى السَّمَآءِ كُوْشِفَ بِاَقْتِرَابِ اَجَلِه فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ

অর্থাৎ যখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আসমানের দিকে দেখলেন, তখন তাঁর সামনে তাঁর ওফাত শরীফ সন্নিকট হওয়া প্রকাশ পেলো। অতঃপর তিনি সেটার খবর দিয়ে দিলেন।

হাদীস শরীফ-১০

মিশকাত শরীফ: ফিতনাসমূহের বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে- হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মদীনা শরীফের একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবা-ই কেরামের উদ্দেশে বললেন, "আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা কি তোমরাও দেখছো?" তাঁরা আরয করলেন, "না"। তখন হুযূর-ই আক্রাম বললেন-

فَاِنِّىْ اَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টির মতো ফিৎনাদি পড়তে দেখছি। বুঝা গেলো যে, এযীদী ও হাজ্জাজী ফিৎনাগুলো, যেগুলো কিছুদিন পরে পতিত হবে, তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সত্যদর্শী চক্ষুযুগল শরীফ ভবিষ্যতের ঘটনাবলী এবং কাছে ও দূরের অবস্থাদি, হাওযে কাউসার, জান্নাত ও দোযখ ইত্যাদি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ওসীলায় হুযূর-ই আক্রামের খাদিমগণকেও মহান পবিত্র আল্লাহ্ এ ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেন।

হাদীস শরীফ-১১

মিশকাত: ২য় খণ্ড: কারামত শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সারিয়াকে এক সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার করে নিহাওয়ান্দে পাঠিয়েছিলেন।

بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ

অর্থাৎ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খোৎবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, "হে সারিয়াহ্, পাহাড়কে নিয়ে নাও।"

কিছুদিন পর ওই সৈন্যবাহিনীর দূত আসলো। তিনি বর্ণনা করলেন, "আমাদেরকে শত্রুরা প্রায় পরাজিত করে ফেলেছিলো। তৎক্ষণাৎ আমরা কোন আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। যিনি বলছিলেন, "হে সারিয়াহ্ পাহাড়কে নিয়ে নাও!" তখন আমরা পাহাড়কে আমাদের পেছনে নিয়ে নিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (শত্রুদের) পরাজিত করলেন।

হাদীস শরীফ-১২

ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফিক্বহে আকবার'-এ, আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী 'জামি'-এ কবীর'-এ হারিস ইবনে নো'মান ও হারিসাহ্ ইবনে নো'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "একদা আমি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর দরবারে হাযির হলাম। তখন সরকার-ই দু'আলম আমাকে বললেন, 'হে হারিস! তুমি কোন্ অবস্থায় দিন পেয়েছো?" আমি আরয করলাম, "সাচ্ছা মু'মিন হিসেবে।" তিনি বললেন, "তোমার ঈমানের হাক্বীক্বত (বাস্তবাবস্থা) কি?" আমি আরয করলাম-

وكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلى عَرْشِ رَبِّىْ بَارِزًا وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلى اَهْلِ الْجَنَّةِ يتزَاوَرُوْنَ فِيْهَا وكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلى اَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُوْنَ فِيْهَا -

অর্থাৎ আমি যেন আল্লাহ্র আরশকে প্রকাশ্যে দেখছি। আর যেন জান্নাতবাসীদেরকে একে অপরের সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ করতে এবং দোযখবাসীদেরকে দোযখে শোর-চিৎকার করতে দেখতে পাচ্ছিলাম।

এ ঘটনা মসনভী শরীফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

هشت جنت هفت دوزخ پیش من-هست پیدا همچو بت پیش شمن

অর্থ: আটটি জান্নাত ও সাতটি দোযখ আমার চোখের সামনে তেমনিভাবে প্রকাশমান রয়েছে, যেমন হিন্দুদের সামনে বোত।

یک بیک وامی شناسم خلق را- همچو گندم من زجو در آسیا

অর্থ: আমি একেক সৃষ্টিকে এমনভাবে চিনি যেমন চাক্কিতে যব ও গম।

که بهشتی که وبیگانه کی است-پیش من پیدا چو مور وماهی است

অর্থ: কে বেহেশতী, কে দোযখী, আমার সামনে মাছ ও পিপঁড়ার মতো।

من بگویم یا فرو بندم نفس-لب گزیدش مصطفے یعنی کہ بس

অর্থ: নিশ্চুপ থাকবো নাকি আরো কিছু বলবো? হুযূর তাঁর মুখে হাত দিয়ে দিয়েছেন আর বলেছেন- "ব্যাস"!

যখন এ সূর্যের কণাগুলোর দৃষ্টিশক্তির এ অবস্থা, জান্নাত ও দোযখ, আরশ ও ফরশ, জান্নাতী ও দোযখীকে নিজের চোখে দেখছেন, তখন ওই উভয় জাহানের সূর্যের দৃষ্টিশক্তি কত বেশী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

---o---

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'হাযির-নাযির'-এর প্রমাণ উম্মতের ফক্বীহ্ ও বিজ্ঞ আলিমদের অভিমতের আলোকে

এক. দুর্‌রে মুখতার: ৩য় খণ্ড: মুরতাদ্দ বিষয়ক অধ্যায়: 'আউলিয়া-ই কেরামের কারামাত' শীর্ষক আলোচনায় আছে- يَا حَاضِرُ يَا نَاظِرُ لَيْسَ بِكُفْرٍ অর্থাৎ 'হে হাযির' 'হে নাযির' বলা কুফর নয়।

'ফাত্ওয়া-ই শামী'তে এর আলোকে বা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

فانَ اَلحُضُوْرَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَاعِعٌ مَا يكُوْنُ مِنْ نَجْوى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَالنَّظْرُ بِمَعْنى الرُّؤْيَةِ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللهَ يَرى - فَالْمَعْنى يَا عَالِمُ يَا مَنْ يَرى (بزازية)

অর্থাৎ কেননা, 'হাযির হওয়া' 'জানা' অর্থে প্রসিদ্ধ। যেমন- ক্বোরআন-ই মীজদে আছে, "তিন জনের গোপন পরামর্শ হয় না, কিন্তু মহান রব তাদের 'চতুর্থ' থাকেন।" আর 'নযর' 'দেখা' অর্থে ব্যবহৃত হওয়াও তেমনি। যেমন মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- "সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন?" সুতরাং 'হে হাযির', 'হে নাযির'-এর অর্থ হলো 'হে জ্ঞাতা, হে দ্রষ্টা!' [বায্যাযিয়াহ্]

দুর্‌রে মুখতার: প্রথম খণ্ড: নামাযের পদ্ধতি শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-

وَيَقْصِدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْاِنْشَاءَ كَاَنَّه يُحَيّ عَلَى اللهِ وَيُسَلِّمُ عَلى نَبِيِّه نَفْسِه

অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যাত'-এর শব্দগুলো বলার সময় নিজে বলছো বলে নিয়্যত করবে। নামাযী যেন নিজেই মহান রবের প্রশংসা করছে এবং নিজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সালাম আরয করছে।

'ফাতাওয়া-ই শামী'তে এ বচনের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে-

اَیْ لَا تَقْصِدُ الْاِخْبَارَ وَالْحِکَایَۃَ عَمَّا وَقَعَ فِی الْمِعْرَاجِ مِنْہُ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَمِنْ رَبِّہٖ وَمِنَ الْمَلٰئِکَۃِ ۔

অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যাত'-এ মি'রাজে ওই কথোপকথনের কাহিনীর অবতারণার নিয়্যত করবে না, যা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এবং মহান রব ও ফেরেশতাদের মধ্যে হয়েছিলো। (বরং হুযূর আকরামকে সামনে হাযির জেনে সালামটি বলবে।)

এ ফক্বীহদ্বয়ের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে 'হাযির-নাযির' বলা 'কুফর' নয়। আর 'আত্তাহিয়্যাত'-এ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে হাযির জেনে সালাম বলবে। 'আত্তাহিয়্যাত' সম্পর্কে আরো অনেক বচন বর্ণিত হয়েছে।

দুই. 'মাজমা'উল বারাকাত'-এ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন-

وعلیہ السلام بر احوال اعمال امت مطلع است بر مقربان وخاصان درگاہ خود مفیض وحاضر وناظر است۔

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম উম্মতের অবস্থাদি ও আমলসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং দরবারের নৈকট্যধন্যদের নিকট ফয়য বা কল্যাণ পৌঁছান আর তিনি হাযির ও নাযির।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর রিসালাহ্-ই হাযদহম (১৮শ পুস্তিকা) 'সুলূকে আক্বরাবুস্ সুবুল বিত্তাওয়াজ্জুহি ইলা- সাইয়্যিদির রুসূল'-এ লিখেছেন-

باچندیں اختلاف وکثرت مذاہب کہ در علماء امت ہست یک کس را دریں مسئلہ اختلافے نیست کہ آنحضرت علیہ السلام بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتوہم تاویل دائم وباقی است وبر اعمال امت حاضر وناظر است ومر طالبان حقیقت را ومتوجہان آنحضرت را مفیض ومربی (ادخال السنان)

অর্থাৎ ওই মতবিরোধ ও ভিন্ন ভিন্ন মত সত্ত্বেও, যেগুলো উম্মতের মধ্যে রয়েছে, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রকৃত জীবন সহকারে, কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপকের সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই জীবিত

আছেন এবং উম্মতের কার্যাদির উপর হাযির-নাযির আছেন আর তিনি বাস্তবতার অন্বেষণকারী ও দরবারে উপস্থিতদেরকে ফয়য বিতরণকারী এবং তাদেরকে লালনকারী। [ইদ্খা-লুস্ সিনান]

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী 'ফুতূহুল গায়ব'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

اما انبیاء علیہم السلام بحیاۃ حقیقی ودنیوی حیّ وباقی ومتصرف اند دریں جاسخن نیست۔

অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম প্রকৃত-পার্থিব জীবন সহকারে জীবিত ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী-এতে কারো দ্বিমত নেই।

তিন. মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ প্রণীত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মিরক্বাত: 'যার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেছে তার নিকটে কি বলা হবে' শীর্ষক অধ্যায়ের শেষ ভাগে বর্ণিত হয়েছে-

وَلاَ تَبَاعُدَ عَنِ الْاَوْلِیَاءِ حَیْثُ طُوِیَتْ لَھُمُ الْاَرْضُ وَحَصَلَ لَھُمْ اَبْدَانٌ مُکْتَسِبَۃٌ مُتَعَدِّدَۃٌ وَجَدُوْھَا فِیْ اَمَاکِنَ مُخْتَلِفَۃٍ فِیْ اٰنٍ وَاحِدٍ ۔

অর্থাৎ আল্লাহর ওলীগণ এক মুহূর্তে (সময়) কয়েক জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন। আর তাঁদের এক সময়ে কয়েকটা দেহ হতে পারে। এটা তাদের জন্য অসম্ভব মনে করোনা। কারণ, যমীনকে তাদের জন্য সংকোচিত করে দেওয়া হয়েছে।

চার. শেফা শরীফে আছে-

اِنْ لَّمْ یَکُنْ فِی الْبَیْتِ اَحَدٌ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّھَا النَّبِیُّ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ

অর্থাৎ যখন ঘরে কেউ থাকে না তখন তুমি বলো, 'হে নবী, আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমতরাজি ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক!

এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর লিখিত 'শরহে শেফা'য় লিখেছেন-

لِاَنَّ رُوْحَ النَّبِیِّ عَلَیْہِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِیْ بُیُوْتِ اَھْلِ الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ কেননা, নবী করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর রূহ মুবারক মুসলমানদের ঘরগুলোতে হাযির থাকে।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর 'মাদারিজুন্নবূয়ত'-এ লিখেছেন-

ذکر کن اورا ودرود بفرست بروے علیہ السلام وباش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات ومی بینی تو اورا متأدب باجلال وتعظیم وہیبت وحیا۔بدانکہ وے علیہ السلام می بیند وی شنود

کلام ترا-زیراکہ وے علیہ السلام متصف است بصفات الٰہیہ ویکے از صفات الٰہی آنست کہ اَنَا جَلِیْسُ مَنْ ذَکَرَنِیْ -

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালামকে স্মরণ করো ও দুরূদ শরীফ প্রেরণ করো। আর স্মরণ করার সময় এমনি থাকো যে, হুযূর আপন জীবন সহকারে, তোমার সামনে আছেন আর তুমিও তাঁকে দেখতে পাচ্ছো; আদব, মহত্ব ও সম্মান প্রদর্শন, ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় ও লজ্জা সহকারে থাকো। আর জানো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দেখছেন, তোমার কথা শুনছেন। কেননা, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহ্‌র (দান ক্রমে, তাঁর) অনেক গুণে গুণান্বিত। আর আল্লাহ্ তা'আলার একটি গুণ হচ্ছে- তিনি খোদ্ এরশাদ করেছেন- 'আমি আমাকে স্মরণকারীর সাথে উপবেশনকারী (সাথে আছি)।'

পাঁচ. ইমাম ইবনুল হাজ্জ 'মাদ্‌খাল' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম ক্বাস্তলানী 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ্' নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ড: পৃ. ৩৮৭: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ 'তাঁর কবর শরীফ যিয়ারত প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন-

وَقَدْ قَالَ عُلَمَآءُنَا لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِه وَحَيوتِه عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ مُشَاهَدَتِه لِاُمَّتِه وَمَعْرِفَتِه بِاَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَآئِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذٰلِكَ جَلِىٌّ عِنْدَه لاَ خِفَاءَ بِه -

অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশা ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি আপন উম্মতকে দেখেন এবং তাদের অবস্থাদি, নিয়্যতসমূহ ও ইচ্ছাগুলো এবং মনের কথাগুলো সম্পর্কে জানেন। এগুলো তাঁর সামনে একেবারে স্পষ্ট, ওইগুলোতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

'মিরক্বাত: শরহে মিশ্‌কাত'-এ মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন-

وَقَالَ الْغَزَالِىُّ سَلِّمْ عَلَيْهِ اِذَا دَخَلْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَاِنَّه عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَحْضُرُ فِى الْمَسَاجِدِ -

অর্থাৎ ইমাম গাযালী বলেছেন, যখন তোমরা মসজিদগুলোতে প্রবেশ করবে, তখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে সালাম আরয করবে; কেননা তিনি মসজিদগুলোতে রয়েছেন।

ছয়. 'নসীমুর রিয়াদ্ব শরহে শেফা-ই ক্বাযী আয়াদ্ব'-এর তৃতীয় খণ্ডের শেষ ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلْاَنْبِيَآءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ مِنْ جِهَةِ الْاَجْسَامِ وَالظَّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَبَوَاطِنُهُمْ وَقُوَاهُمُ الرُّوْحَانِيَّةُ مَلَكِيَّةٌ وَلِذَا تَرٰى مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَسْمَعُ اَطِيْطَ السَّمَآءِ وَتَشُمُّ رَائِحَةَ جِبْرَآئِيْلَ اِذَا اَرَادَ النُّزُوْلَ اِلَيْهِمْ -

অর্থাৎ সম্মানিত নবীগণ শারীরিক ও বাহ্যিকভাবে বশর (মানুষ)-এর সাথে আর তাঁদের বাত্বিন ও রূহানী ক্ষমতা ফেরেশতাসুলভ। এ জন্য তাঁরা যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তগুলো দেখতে পান। আর আসমানগুলোর চড়চড় শব্দও শুনতে পান। তদুপরি, হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর খুশ্‌বু পেয়ে যান, যখন তিনি তাঁদের উপর অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা করেন।

সাত. 'দালা-ইলুল খায়রাত'-এর ভূমিকায় আছে-

وَقِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ اَرَاَيْتَ صَلٰوةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَّاْتِىْ بَعْدَكَ مَا حَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مُحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلٰوةَ غَيْرِهِمْ عَرَضًا -

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনার নিকট থেকে যারা দূরে রয়েছে এবং যারা পরে আসবে, তাদের দুরূদ শরীফগুলোর অবস্থা আপনার নিকট কেমন? তদুত্তরে হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ ফরমায়েছেন- আমি ভালবাসাধারীদের দুরূদ নিজে শুনি এবং তাদেরকে চিনি। আর যাদের অন্তরে ভালবাসা নেই, তাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।

আট. ক্বাযী আয়াযের শেফা শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ اَقُوْلُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه -

অর্থাৎ হযরত আলক্বামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তখন বলি, "হে নবী, আপনার উপর নাযিল হোক সালাম, তাঁর রহমত ও বরকতসমূহ।"

এর সমর্থন করেছেন ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ 'মসজিদে প্রবেশ করার সময়কার দো'আ' শীর্ষক অধ্যায়ে হাদীস শরীফ বর্ণনা করে।

নয়. 'মাদারিজুন্নুবূয়ত: ২য় খণ্ড: ৪৫০পৃ. ক্বিসমে চাহারম: ওয়াস্‌লে হায়াতে আম্বিয়া'য় আছে-

اگر بعد ازاں گویند کہ حق تعالی جسد شریف را حالتے وقدرتے بخشیدہ است کہ در ہر مکانے کہ خواہد تشریف بخشد خواہ بعینہٖ خواہ بمثال خواہ برآسماں خواہ برزمیں خواہ در قبر یاغیر وے صورتے دارد باوجود ثبوت نسبت خاص بقبر در ہمہ حال -

অর্থাৎ এরপর যদি বলা হয় যে, মহান রব নূরের পবিত্র শরীরকে এমন অবস্থা ও ক্ষমতা দান করেছেন যে, যে কোন স্থানে চান তাশরীফ নিয়ে যাবেন- চাই হুবহু এ শরীরে হোক, চাই এতদ্‌সদৃশ শরীরে, চাই আসমানের উপর, চাই কবরে, তাহলে তা সঠিক। অবশ্য কবর শরীফের সাথে সর্বাবস্থায় সম্পর্ক থাকে।

দশ. 'মিসবাহুল হিদায়ত', অনুবাদ- 'আওয়ারিফুল মা'আরিফ', কৃত. শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী: ১৬৫ পৃষ্ঠায় আছে-

پس باید کہ بندہ ،ہمچناں کہ حق سبحانہ را پیوستہ بر جمیع احوال خود ظاہرًا وباطنًا واقف ومطلع بیند رسول اللہ علیہ السلام را -نیز ظاہر و باطن حاضر داند تا مطالعہ صورت تعظیم وو قاراو ہموارہ بہ محافظت آداب حضرتش دلیل بود واز مخالفت وے سترًا واعلانًا شرم دارد وہیچ دقیقہ از دقائق آداب صحبت او فرونہ گزارد -

অর্থাৎ সুতরাং উচিত হচ্ছে- বান্দা যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যাহির ও বাত্বিন সর্বাবস্থায় অবগত জানে, অনুরূপ হুযূর আলায়হিস্ সালামকেও (আল্লাহর দানক্রমে) যাহির ও বাত্বিনে হাযির বলে জানবে, যাতে তাঁর আকৃতিকে দেখার, তাঁর সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করার এবং এ মহান দরবারের আদব রক্ষার পক্ষে দলীল হয়ে যায়। আর যাহির ও বাত্বিনে তাঁর বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করে এবং হুযূর-ই আক্রাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর 'পবিত্র সঙ্গ'র আদবের কোন মুহূর্তকে হাতছাড়া না করে।

---o---

আরো কতিপয় বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত

উম্মতের ফক্বীহ্ ও বিজ্ঞ আলিমদের এসব অভিমত থেকে হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর হাযির-নাযির হওয়া অতি উত্তমরূপে স্পষ্ট হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি-নামাযী নামাযের মধ্যে হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি কিভাবে খেয়াল রাখবে। এ সম্পর্কে আমি দুর্‌রে মুখতার ও শামীর ইবারতগুলো এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে পেশ করেছি। অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের আরো কিছু ইবারত দেখুন এবং নিজেদের ঈমানকে তাজা করুন।

এক. 'আশি''আতুল লুম্'আত : কিবাতুস্ সালাত: বাবুত্ তাশাহ্হুদ' এবং 'মাদারিজুন্নুবূয়ত: ১ম খণ্ড: ১৩৫ পৃষ্ঠা বাবে পঞ্জম: যিকরে ফাদ্বা-ইলে আঁ হযরত'-এ শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন-

وبعضے عرفا گفتہ اند کہ ایں خطاب بجہت سریان حقیقت محمد یہ است در ذرائر موجودات وافراد ممکنات پس آنحضرت در ذات مصلیاں موجود وحاضر است - پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد وازیں شہود غافل نہ بود تا بانوار قرب واسرار معرفت منور وفائز گردد -

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক আরিফ বান্দা বলেছেন, 'আত্তাহিয়্যাত'-এ সম্বোধন এজন্য করা হয় যে, 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মাদিয়াহ্' সৃষ্টিজগতের কণায় কণায় এবং সৃষ্টির প্রতিটি ব্যক্তিতে প্রসার লাভ করেছে। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযীদের সত্তায় মওজূদ ও হাযির রয়েছেন। নামাযীর উচিৎ হচ্ছে এ অর্থ সম্পর্কে অবগত থাকা এবং এ উপস্থিত বস্তু সম্পর্কে উদাসীন না থাকা, যাতে নৈকট্যের নূর (আলো) ও মা'রিফাতের (পরিচিতি) রহস্যাদি দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে যায়।

দুই. 'ইহ্ইয়াউল উলূম': ১ম খণ্ড: বাবে চাহারম: ফসলে সুয়াম: নামাযীর জন্য বাত্বেনী শর্তাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন-

وَاَحْضِرْ فِىْ قَلْبِكَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه -

অর্থাৎ এবং আপন অন্তরে নবী আলায়হিস্ সালামকে এবং তাঁর যাতে পাককে হাযির বলে জানো আর বলো- 'হে নবী, আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকতরাজি বর্ষিত হোক।'

তিন. 'মিরক্বাত: বাবুত্ তাশাহ্হুদ'-এও অনুরূপ রয়েছে।

চার. 'মিস্কুল খিতাম'-এ নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূ-পালী ওহাবী উক্ত কিতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় এ একই ইবারত লিখেছেন, যা আমি এক্ষুণি 'আশি''আতুল লুম্'আত'-এর 'আত্তাহিয়্যাত'-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছি। তা হচ্ছে- নামাযীর উচিৎ হুযূর-ই আক্রামকে হাযির-নাযির জেনে 'আত্তাহিয়্যাত'-এ সালাম করা। তার পরক্ষণে এ পংক্তি লিখেছেন-

در راه عشق مرحلۂ قرب وبعد نیست - می بینمت عیاں ودعامی فرستمت

অর্থাৎ ইশক্বের পথে দূর ও নিকটের 'মানযিল' (যাত্রাবিরতির স্থান) নেই। আমি তোমাদেরকে দেখছি আর দো'আ করছি।

পাঁচ. আল্লামা শায়খ-ই মুজাদ্দিদ বলছেন-

وَخُوْطِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاَنَّه اِشَارَةٌ اِلى اَنَّه تَعَالى يُكْشَفُ لَه عَنِ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ اُمَّتِه حَتّى يَكُوْنَ كَالْحَاضِرِ لِيَشْهَدَ لَهُمْ بِالْعَقْلِ اَعْمَالَهُمْ وَلِيَكُوْنَ تَذَكُّرُ حَضُوْرِه سَبَبًا لِمَزِيْدِ الْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ -

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা যেন এদিকে ইঙ্গিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্রামের উম্মতের মধ্যে নামাযীর অবস্থা তাঁর উপর প্রকাশ করে দেন। এমনকি তিনি 'হাযির'-এর মতো হয়ে যান, তার আমলগুলো অনুধাবন করেন এবং এজন্য যে, তাঁর হাযির হবার খেয়াল অধিক বিনয় ও একাগ্রতার (খুদ্বূ' ও খুশূ'র) কারণ হয়ে যায়।

'হাযির-নাযির'-এর মাসআলার উপর কিছু কিছু ফিক্বহী মাসআলা-মাসা-ইলও মাওকূফ রয়েছে। ফক্বীহ্গণ বলেন, স্বামী যদিও পূর্বাঞ্চলে থাকে, আর স্ত্রী থাকে পশ্চিমাঞ্চলে। আর তাদের সন্তান পয়দা হয়। অতঃপর স্ত্রী বলে, "সন্তান আমার", তাহলে সন্তান সত্যি তাঁরই। কারণ, হতে পারে ইনি (স্বামী) আল্লাহর ওলী, আর কারামত হিসেবে তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকটে পৌঁছেছেন। দেখুন- ফাতাওয়া-ই শামী: ২য় খণ্ড: বাবে সুবূতে নসব (বংশ প্রতিষ্ঠার অধ্যায়)।

'ফাতাওয়া-ই শামী: ৩য় খণ্ড: বাবুল মুরতাদ্দ্: মাত্বলাব-কারামাতুল আউলিয়া'য় আছে-

وَطَىُّ الْمُسَافَةِ مِنْهُ لِقُوْلِهعليَهَ السلاَّم زُوِيَتْ لِى الْاَرْضُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالُوْا فِيْمَنْ كَانَ فِى الْمَشْرِقِ وَتَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِالْمَغْرِبِ فَاَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُه وَفِى التَّاتَارِ خَانِيْهْ اِنَّ هذِهِ الْمَسْئَلَةُ تُؤَيِّدُ الْجَوَازَ -

অর্থাৎ আর পথ অতিক্রম করাও এ-ই কারামতের অন্তর্ভুক্ত। তাও হুযূর-ই আক্রামের এরশাদ অনুসারে। (হুযূর এরশাদ ফরমান) "আমার জন্য যমীনকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে।" এ থেকেও ওই মাসআলা প্রকাশিত হয়, যা ফক্বীহ্গণ বলেছেন। তা হচ্ছে- কোন ব্যক্তি পূর্বাঞ্চলে থাকে, আর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকারী নারীকে বিবাহ করে। তারপর ওই নারী সন্তান প্রসব করে। তাহলে ওই সন্তান ওই পুরুষের বলে সাব্যস্ত হবে। আর 'তাতারখানিয়াহ্'য় আছে- এ মাসআলা ওই কারামত বৈধ হওয়াকে সমর্থন করে।

ফাতাওয়া-ই শামীর এ স্থানেই রয়েছে-

وَالْاِنْصَافُ مَا ذَكَرَهُ الْاِمَامُ النَّسَفِىُّ حِيْنَ سُئِلَ عَمَّا يُحْكى اَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ تَزُوْرُ وَاحَدًا مِّنَ الْاَوْلِيَآءِ هَلْ يَجُوْزُ الْقَوْلُ بِهِ فَقَالَ نَقْضُ الْعَادَةِ عَلى سَبِيْلِ الْكَرَامَةِ لِاَهْلِ الْوِلَايَةِ جَآئِزٌ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ -

অর্থাৎ ন্যায় বিচারের কথা হচ্ছে সেটাই, যা ইমাম নাসাফী তখনই বলেছেন, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে- কথিত আছে যে, কা'বা এক ওলীর যিয়ারতে যেতো। এটা বলা কি জায়েয? তদুত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর ওলীগণের জন্য অলৌকিক বা সাধারণ নিয়মের বিপরীত বিষয় কারামতই হয়। এটা আহলে সুন্নাতের মতে জায়েয বা বৈধ।

এ ইবারত থেকে বুঝা গেলো যে, কা'বা-ই মু'আয্যামাও আউলিয়া-ই কেরামের যিয়ারত করার জন্য বিশ্বে পরিভ্রমণ করে।

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান': 'সূরা-ই মুল্ক'-এর শেষ ভাগে আছে-

قَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِىُّ :وَالرَّسُوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ الْخِيَارُ فِى طَوَافِ الْعَالِمِ مَعَ اَرْوَاحِ الصَّحَابَةِ لَقَدْ رَاهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْاَوْلِيَآءِ -

অর্থাৎ ইমাম গাযালী বলেছেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দুনিয়ায় আপন সাহাবীদের রূহগুলোর সাথে পরিভ্রমণ করার ইখতিয়ার রয়েছে। তাঁকে আল্লাহর অনেক ওলী দেখেছেন।

'ইম্বা-হুল আয্কিয়া ফী হায়াতিল আউলিয়া', কৃত. আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী-এর ৭ম পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

النَّظَرُ فِىْ اَعْمَالِ اُمَّتِه وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالدُّعَآءُ بِكَشْفِ الْبَلَآءِ عَنْهُمْ وَالتَّرَدُّدُ فِى اَقْطَارِ الْاَرْضِ وَالْبَرَكَةُ فِيهَا وَحُضُوْرُ جَنَازَةٍ مِنْ صَالِحِي اُمَّتِه فَاِنَّ هذِهِ الْاُمُوْرَ مِنْ اَشْغَالِه كَمَا وَرَدَتْ بِذلِكَ الْحَدِيْثُ وَالْاثَارُ -

অর্থাৎ আপন উম্মতের আমলগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের গুনাহ্গুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের বালা-মুসীবৎ দূরীভূত হবার জন্য দো'আ করা, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আসা যাওয়া করা, তাতে বরকত দেওয়া এবং আপন উম্মতের মধ্যে কোন নেক্কার ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযায় যাওয়া, এসব ক'টি বিষয় হুযূর-ই আক্রামেরই কাজ। যেমন- এর পক্ষে 'হাদীসসমূহ ও আ-সার' বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গাযালী তাঁর 'আল মুনক্বিয মিনাদ্ব দ্বোয়ালাল'-এ বলেন-

ارباب قلوب مشاہدہ می کنند در بیداری انبیاء وملائکہ را وہم کلامی می شوند بایشاں

অর্থাৎ হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাগ্রতাবস্থায় নবীগণ ও ফেরেশতাগণ (আলায়হিমুস্ সালামকে দেখতে পান এবং তাঁদের সাথে কথা বলেন।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী তার 'শরহে সুদূর' নামক কিতাবে লিখেছেন-

اِنْ اِعْتَقَدَ النَّاسُ اَنَّ رُوْحَه وَمِثَالَه فِىْ وَقْتِ قِرَأَةِ الْمَوْلِدِ وَخَتْمِ رَمَضَانَ قِرَأَةَ الْقَصَائِدِ يَحْضُرُ جَازَ ـ

অর্থাৎ যদি লোকেরা এ আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর রূহ ও তাঁর অনুরূপ শরীর মাওলেদ শরীফ পড়ার সময়, রমযানে খতম পড়ার সময় এবং না'ত খানির সময় আসে, তবে তা জায়েয (বৈধ)।

মৌং আবদুল হাই সাহেব লক্ষ্ণৌভী তাঁর পুস্তিকা 'তারাভীহুল জিনান বি তাশরীহে হুক্মে শরবিদ্ দুখান'-এ বলেন, এক ব্যক্তি না'ত খাঁ ছিলো এবং হুক্কাও পান করতো। সে স্বপ্নে দেখেছে, নবী করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করছিলেন, "যখন তুমি মাওলেদ শরীফ পড়ো, তখন আমি উক্ত মজলিসে উপস্থিত হই; কিন্তু যখন হুক্কা এসে যায়, তখন আমি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত মজলিস থেকে ফিরে আসি।"

এসব ইবারত থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর পবিত্র দৃষ্টি সবসময় বিশ্বের প্রতিটি কণার প্রতি থাকে। আর নামায, তিলাওয়াতে ক্বোরআন, মাহফিলে মীলাদ শরীফ এবং না'ত খানির মজলিসগুলোতে, অনুরূপ নেক্কার লোকদের জানাযার নামাযে, বিশেষ করে সশরীরে তাশরীফ রাখেন। (সদয় উপস্থিত থাকেন)।

'তাফসীর-ই রুহুল বয়ান': পারা ২৬: সূরা ফাত্হ'-এর আয়াত اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا -এর তাফসীরে লিখেছেন-

فَانَّه لَمَّا كَانَ اَوَّلُ مَخْلُوْقٍ خَلَقَهُ اللهُ كَانَ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيَّةِ الْحَقِّ وَشَاهِدًا بِمَا اُخْرَجَ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ مِنَ الْاَرْوَاحِ وَالنُّفُوْسِ وَالْاَجْرَامِ وَالْاَرْكَانِ وَالْاَجْسَادِ وَالْمَعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّ وَالشَّيْطَانِ وَالْاِنْسَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِئَلاَّ يَشُذَّ عَنْهُ مَا يُمْكِنُ لِلْمَخْلُوْقِ وَاَسْرَارُ اَفْعَالِه وَعَجَائِبُه ـ

অর্থাৎ যেহেতু হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি, সেহেতু তিনি আল্লাহর ওয়াহ্দানিয়াত (একত্ব)-এর সাক্ষী এবং তিনি ওইসব জিনিষ প্রত্যক্ষকারী, যেগুলো অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এসেছে, অর্থাৎ রূহসমূহ, সত্তাগুলো, দেহরাজি, খনিজ বস্তুসমূহ, তৃণলতা, প্রাণীকুল, ফেরেশতাগণ ও মানবজাতি প্রমুখ, যাতে তাঁর সামনে মহান রবের ওইসব রহস্য ও আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ গোপন না থাকে, যেগুলো কোন সৃষ্টির জন্য সম্ভব।

এখানে কিছুটা আগে গিয়ে তিনি বলেন-

فَشَاهَدَ خَلْقَه وَمَا جَرٰى عَلَيْهِ مِنَ الْاِكْرَامِ وَالْاِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ وَمَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ مَا جَرٰى اللهُ عَلَيْهِ وَشَاهَدَ خَلْقَ اِبْلِيْسَ وَمَا جَرٰى عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টি হওয়া, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হওয়া এবং ভুলের কারণে জান্নাত থেকে পৃথক হওয়া, অতঃপর তাঁর তাওবা কবূল হওয়া, শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বিষয়, যেগুলো তাঁর উপর সংঘটিত হয়েছে, সবই দেখেছেন, আর ইবলীসের সৃষ্টি এবং যা কিছু তার ব্যাপারে ঘটেছে তাও দেখেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকাশ্য জগতে প্রকাশ পাবার পূর্বে প্রত্যেকের প্রতিটি অবস্থা হুযূর-ই আক্রাম স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন।

এ রূহুল বয়ান প্রণেতা মহোদয় একটু সামনে গিয়ে এখানেই লিখেছেন-

قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ اِنَّ مَعَ كُلِّ سَعِيْدٍ رَفِيْقُه مِنْ رُّوْحِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ هِىَ الرَّقِيْبُ الْعَتِيْدُ عَلَيْهِ وَكَمَّاطُفِى الرُّوْحُ الْمُحَمَّدِىُّ مِنْ اٰدَمَ الَّذِىْ كَانَ بِه دَآئِمًا لَا يَضِلُّ وَلَا يَنْسٰى جَرٰى عَلَيْهِ مَاجَرٰى مِنَ النِّسْيَانِ وَمَا يَتْبَعُه ـ

অর্থাৎ কোন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি (ইমাম) বলেছেন, প্রত্যেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সাথে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর রূহ থাকে। আর এটাই হলো 'রাক্বীব-ই আতীদ'-এর মর্মার্থ। আর যখন 'রূহ-ই মুহাম্মদী'র স্থায়ী মনোনিবেশ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে সরে গেলো, তখন তাঁর থেকে ভুল ও সেটার ফলশ্রুতিগুলো সংঘটিত হলো।

এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে তখন তার ঈমান বের হয়ে যায়।"

তাফসীর-ই রুহুল বয়ান-এর এক স্থানে আছে- 'ঈমান' মানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার কৃপাদৃষ্টি। অর্থাৎ যে মু'মিন কোন ভাল কাজ করে, সে তা হুযূর-ই আক্রামের কৃপাদৃষ্টিতে ওই কাজের সামর্থ্য লাভ করে। আর যে গুনাহ্ করে, তা তাঁর দিক থেকে কৃপাদৃষ্টি ও মনোনিবেশ না থাকার কারণেই করে থাকে।

এ থেকে হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর 'হাযির-নাযির হওয়া' অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ক্বসীদাহ্-ই নো'মান এ বলেছেন-

وَاِذَا سَمِعْتُ فَعَنْكَ قَوْلاً طَيِّبًا ـ وَاِذَا نَظَرْتُ فَلاَ اَرٰى اِلاَّكَ

অর্থাৎ যখন আমি শুনি, তখন আপনার যিক্র (প্রশংসা)ই শুনি। আর যখন দেখি তখন আপনি ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্টিগোচরই হয়না।

ইমাম-ই আ'যম কূফায় অবস্থান করে হুযূর আলায়হিস্ সালামকে চতুর্দিকে দেখতে পান।

---o---

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'হাযির-নাযির'-এর প্রমাণ বিরুদ্ধবাদীদের কিতাবাদি থেকে

এক. 'তাযীরুন্নাস': পৃ. ১০-এ মৌলভী ক্বাসেম সাহেব নানূতবী, ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা, বলেন- اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ কে مِنْ اَنْفُسِهِمْ আয়াতাংশের মর্মার্থ অনুসারে দেখুন। তখন একথা প্রমাণিত হবে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর, আপন উম্মতের সাথে ওই নৈকট্য রয়েছে, যেমন নৈকট্য তাদের প্রাণেরও তাদের সাথে নেই। কেননা, اَوْلٰى মানে اَقْرَبُ(অধিকতর নিকটে)।

দুই. মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী কৃত 'সেরাতুল মুস্তাক্বীম' (অনূদিত)-এর ১৩ পৃষ্ঠার ৪র্থ হিদায়ত- ইশক্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি কয়লা ও আগুনের উপমা দিয়ে বলেন, "এভাবে, যখন ওই প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ আত্মা (نفس كامل)কে রাহমানী (খোদায়ী) আকর্ষণ ও টানের তরঙ্গরাজি 'আহাদিয়াত' (আল্লাহর একত্ব)-এর সমুদ্রগুলোর সর্বনিম্ন স্তরে টেনে নিয়ে যায়, তখন اَنَا الْحَقُّ (আমি সত্য খোদা) এবং لَيْسَ فِىْ جُبَّتِىْ سِوَى اللهِ(আমার জুব্বায় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই)-এর আওয়াজ তা থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। আর এ হাদীস-ই ক্বুদসী-

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُهُ بِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তার (অর্থাৎ বান্দার) ওই কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে, আমি তার ওই চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে এবং আমি তার ওই হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে।... অন্য বর্ণনা অনুসারে وَلِسَانَهُ الَّذِىْ يَتَكَلَّمُ بِهٖ (আমি তার ওই জিহ্বা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে কথা বলে) এ অবস্থারই বর্ণনা মাত্র।

এ ইবারতে পরিস্কার ভাষায় এ মর্মে স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, যখন মানুষ 'ফানাফিল্লাহ্' (আল্লাহ্তে বিলীন) হয়ে যায়, তখন সে খোদায়ী ক্ষমতায় দেখে, শুনে, স্পর্শ করে ও কথা বলে। অর্থাৎ বান্দা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পায়; প্রত্যেক নিকটস্থ ও দূরবর্তী বস্তুগুলোকে ধারণ করে, এটাই হচ্ছে 'হাযির-নাযির'-এর মর্মার্থ। আর যখন মা'মূলী মানুষ 'ফানাফিল্লাহ্' হয়ে এ উচুঁ মর্যাদায় পৌঁছে

যেতে পারে, তখন সাইয়্যেদুল ইনসি ওয়া জান্ন (মানব ও জিন্ জাতির সরদার) আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে বড় 'ফানাফিল্লাহ্' কে হতে পারে? সুতরাং হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার 'হাযির-নাযির' হলেন।

তিন. 'ইমদাদুস্ সুলূক'-এর ১০ম পৃষ্ঠায় মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহী বলেছেন,

ہم مرید بیقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست، پس ہر جاکہ مرید باشد قریب یا بعید اگر چہ از شیخ دور است بامار وحانیت او دور نیست چوں ایں امر محکم دارد ہر وقت شیخ را بیاد دارد تا ربط قلب پیدا آید وہر دم مستفید بود، مرید در حال واقعہ محتاج شیخ بود، شیخ بقلب حاضر آورد بلسان حال سوال کند البتہ روح شیخ باذن اللہ تعالی القا خواہد کرد، مگر ربط تام شرط است وبسبب ربط قلب شیخ رالسان قلب ناطق می شود وبسوئے حق تعالی راہ می کشاید وحق تعالی اورا محدث می کند-

অর্থাৎ মুরীদ একথাও নিশ্চিতভাবে জানবে যে, শায়খের রূহ এক জায়গায় বন্দী নয়, মুরীদ যেখানেই থাকুক না কেন- নিকটে হোক কিংবা দূরে, যদিও পীরের সত্তা থেকে দূরে থাকে, কিন্তু পীরের রূহানিয়াত দূরে নয়। যখন একথা পাকাপোক্ত হয়ে গেলো, তখন সবসময় পীরকে স্মরণে রাখবে, যাতে তাঁর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক প্রকাশ পায় এবং সর্বদা তা দ্বারা উপকৃত হতে থাকে। মুরীদ বাস্তব ঘটনার অবস্থায় পীরের মুখাপেক্ষী থাকে। শায়খ (পীর)কে নিজের হৃদয়ে হাযির করে অবস্থার ভাষায় তাঁর নিকট থেকে চাইবে। তখন পীরের রূহ, আল্লাহ্র হুকুমে অবশ্যই ইলক্বা করবে (অনুপ্রেরণা যোগাবে); তবে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক থাকা পূর্বশর্ত। আর শায়খ বা পীরের সাথে ওই সম্পর্কের কারণে হৃদয়ের রসনা বাক্শক্তি সম্পন্ন হয়ে কথা বলতে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে পথ খুলে যায়। আর আল্লাহ্ তাকে ইলহাম বিশিষ্ট করে দেন।

উপরোক্ত ইবারত থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রতীয়মান হয়-

১. পীর মুরীদের নিকট হাযির-নাযির।
২. মুরীদ পীরের ধ্যানে মগ্ন থাকবে।
৩. পীর প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ করেন।
৪. মুরীদ পীরের নিকট চাইবে।
৫. পীর মুরীদের মনে ইলক্বা করেন (অনুপ্রেরণা যোগান)।

৬. পীর মুরীদের ক্বলব (হৃদয়) জারী (সচল) করেন।

যখন পীরের মধ্যে এমন সব ক্ষমতা থাকে, যখন যিনি ফেরেশতা ও মানব জাতির শায়খুশ্ শুয়ূখ (পীরগণের পীর) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এ ছয়টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য মানলে শির্ক হবে কেন? মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর এ ইবারত তো হাযির-নাযিরের সকল বিরুদ্ধবাদীর সমস্ত মাযহাব বা মতামতের উপর পানি ঢেলে দিয়েছে। (নিশ্চিহ্ন বা অচল করে দিয়েছে।) আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান' (তাদের ঈমানের সব শক্তি) খতম।

চার. হিফযুল ঈমান: পৃ.৭-এ মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী লিখেছেন-

ابویزید سے پوچھا گیا طی زمین کی نسبت تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں-دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لحظہ میں قطع کر جاتا ہے

অর্থাৎ হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে যমীন অতিক্রম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বলেন- "এটা বিশেষ বুযুর্গীর কোন বিষয় নয়। দেখুন, ইবলীস পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি মাত্র মুহূর্তে অতিক্রম করে যাচ্ছে।"

এ ইবারতে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হয়েছে যে, মুহূর্তের মধ্যে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে পৌঁছে যাওয়া 'আহলুল্লাহ্' (আল্লাহর ওলীগণ) কেন, কাফির শয়তানের পক্ষেও সম্ভব; বরং এমনি ঘটেই যাচ্ছে। এটাই তো হাযির-নাযিরের মর্মার্থ; এটা কিন্তু মৌং ইসমাঈল দেহলভীর 'তাক্বভিয়াতুল ঈমান'- অনুসারে শির্ক।

পাঁচ. 'মিসকুল খিতাম', কৃত: নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী ওহাবীর মন্তব্য আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে তিনি বলেন- 'আত্তাহিয়্যাত'-এ 'আস্সালামু আলায়কা' (হে নবী, আপনাকে সালাম) দ্বারা সম্বোধন এ জন্য করা হয় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বিশ্বের অণু-পরমাণুতে মওজুদ রয়েছেন। সুতরাং তিনি নামাযীর সত্তায়ও মওজুদ এবং হাযির রয়েছেন।

উল্লেখ্য, উপরি উক্ত ইবারতগুলো দ্বারা হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যে 'হাযির-নাযির' তা অতি উত্তমরূপে স্পষ্ট হয়।

---o---

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যৌক্তিক দলীলাদি দ্বারা ‘হাযির-নাযির’ প্রমাণিত

সমস্ত মুসলমান একথার উপর একমত যে, হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী সত্তা হচ্ছে- ‘জামি‘ই কামালাত’ অর্থাৎ সমস্ত গুণের ধারক; অর্থাৎ যে পরিমাণ পূর্ণতা ও গুণাবলী সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম, মহান ওলীগণ অথবা অন্য কোন মাখলূক্ব পেয়েছেন কিংবা পাবেন, ওই সবই বরং ওইগুলো অপেক্ষাও বেশী হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে দান করা হয়েছে; বরং হুযূর-ই আক্রামেরই মাধ্যমে তাঁরা পেয়েছেন ও পাবেন। ক্বোরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে- فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ (সুতরাং আপনি তাদের পথে চলুন)। এর ব্যাখ্যায় (তাফসীর) ‘রূহুল বয়ান’-এ আছে- فَجَمَعَ اللهُ كُلَّ خَصْلَةٍ فِيْ حَبِيْبِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ অর্থাৎ “সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক নবীর প্রতিটি গুণ তাঁর হাবীব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে দান করেছেন।” মাওলানা জামী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন-

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری-آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

অর্থাৎ হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর ‘দম’ বা ‘ফুঁক’, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ‘শুভ্র হস্ত’। মোটকথা, তাঁরা (সম্মানিত সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম) যত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য লাভ করেছেন, সবই হে আল্লাহর হাবীব! আপনি একাই পেয়েছেন।

তাছাড়া, মৌলভী ক্বাসেম নানূতবী সাহেব তার লিখিত ‘তাহ্যীরুন্নাস’-এর ৪৯তম পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

“অন্যান্য নবীগণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে তাঁদের উম্মতদের নিকট পৌঁছাতেন। মোটকথা, অন্যান্য নবীগণের নিকট যা কিছু আছে, তা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফারই ছায়া ও প্রতিবিম্ব।”

এ নিয়মের ভিত্তিতে ক্বোরআন, হাদীস ও বিজ্ঞ আলিমদের অভিমতরূপী অনেক দলীল-প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু বিরুদ্ধবাদীরা এ বিষয়টি মেনে নেয়, সেহেতু এর উপর বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং

প্রথম নিয়ম এটাই সর্বজন স্বীকৃত যে, যে পূর্ণতা ও গুণই কোন সৃষ্টি পেয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গরূপে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে দান করা হয়েছে। আর প্রত্যেক জায়গায় ‘হাযির-নাযির হওয়া’ অনেক সৃষ্টিকে দান করা হয়েছে। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, এ গুণ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকেও দান করা হয়েছে। **এখন আমি বর্ণনা করছি-**

‘হাযির-নাযির হওয়া’ কোন কোন সৃষ্টিকে দান করা হয়েছে। আমি ‘হাযির-নাযির’ বিষয়ের উপর আলোচনার ভূমিকায় বলেছি যে, ‘হাযির-নাযির’ হওয়ার অর্থ তিনটি- ১. এক জায়গায় রয়ে সমগ্র বিশ্বকে হাতের তালুর ন্যায় দেখা, ২. এক মুহূর্তে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করা এবং ৩. শত-সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থানরত কাউকে সাহায্য করা। অর্থাৎ এ দেহ কিংবা অনুরূপ দেহ একাধিক জায়গায় মওজুদ থাকা। এগুণাবলী অনেক মাখলূক্বকে দান করা হয়েছে। যেমন-

এক. ‘রূহুল বয়ান’ ‘খাযিন’ ও ‘তাফসীর-ই কবীর’ ইত্যাদিতে পারা-৭, সূরা আন্‘আম-এর আয়াত- حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

جُعِلَتِ الْاَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّشْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَآءَ

অর্থাৎ মালাকুল মাওত (হযরত আয্‌রাঈল আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য সমস্ত বিশ্বকে ‘পাত্র’-এর মতো করে দেওয়া হয়েছে যেন যেখান থেকে চান নিয়ে নিতে পারেন।

এ ‘রূহুল বয়ান’-এ এখানেই আছে-

لَيْسَ عَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ صَعُوْبَةٌ فِيْ قَبْضِ الْاَرْوَاحِ وَاِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ فِيْ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ -

অর্থাৎ মালাকুল মাওতের জন্য রূহ্ কব্জ করার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয়না যদিও রূহ অনেক হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় হয়।

‘তাফসীর-ই খাযিন’-এ এখানেই রয়েছে-

مَا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ شَعْرٍ وَلَا مَدَرٍ اِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ يُطِيْفُ بِهِمْ يَوْمًا مَرَّتَيْنِ -

অর্থাৎ এমন কোন তাঁবুবাসী ও ঘরের অধিবাসী নেই, যার নিকট মাওত প্রতিদিন দু’বার হাযির হয় না।

মিশকাত শরীফ: আযানের ফযীলত শীর্ষক অধ্যায়ে আছে- যখন আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) হয়, তখন শয়তান ৩৬ মাইল দূরে পালিয়ে যায়। অতঃপর

যখন এটা (আযান ও ইক্বামত) সমাপ্ত হয়, তখনই সে আবার হাযির হয়ে যায়। এ আগুনের তৈরী দোযখীর গতির অবস্থা এটাই।

যখন আমরা ঘুমাই, তখন আমাদের একটি রূহ আমাদের দেহ থেকে বের হয়ে বিশ্বে ভ্রমণ করে, যাকে 'রূহ-ই সায়রানী' বলা হয়। এর প্রমাণ রয়েছে পবিত্র ক্বোরআনে- فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى তরজমা: অতঃপর যার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাকে রুখে রাখেন এবং অপরটাকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। [৩৯:৪২, কান্‌যুল ঈমান।]

আর যেখানে কেউ ওই দেহের নিকট এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাকে জাগ্রত করেছে, অমনি ওই রূহ, যা এখন মক্কা মু'আয্‌যামাহ্ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলো, তাৎক্ষণিকভাবে এসে ওই দেহে প্রবেশ করে আর ঘুমন্ত মানুষটি জেগে যায়।

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ আয়াত- وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ (৬:৬০)-এর ব্যাখ্যায় রয়েছে فَاِذَا اِنْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ عَادَتِ الرُّوْحُ اِلٰى جَسَدٍ بِاَسْرَعَ مِنْ لَحْظَةٍ অর্থাৎ যখন মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন রূহ শরীরে একটা মাত্র মুহূর্ত অপেক্ষাও কম সময়ে ফিরে আসে।

আমাদের দৃষ্টির আলো মুহূর্তের মধ্যে আসমানগুলোতে গিয়ে যমীনের উপর ফিরে এসে যায়। আমাদের ধারণা-কল্পনা এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ভ্রমণ করে। বিজলী, তার, টেলিফোন ও লাউড স্পীকারের গতি ও শক্তির এ অবস্থা যে, আধা সেকেণ্ডে পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশ অতিক্রম করে নেয়। হযরত জিব্রাঈলের গতি-দ্রুততার এমন অবস্থা যে, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম যখন কূপের উপরিভাগের অর্ধেকাংশ অতিক্রম করে নিচের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা' থেকে রওনা হয়েছিলেন। এদিকে হযরত ইয়ূসুফ কূপের তলদেশ পর্যন্ত তখনো পৌঁছাননি, হযরত জিব্রাঈল সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। (আর নিজের পাখা বিছিয়ে দিয়ে হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে তাতে ধারণ করে নিয়েছিলেন।) দেখুন, তাফসীর-ই রূহুল বয়ানে আয়াত-اَنْ يَجْعَلُوْهُ فِىْ غَيَابَةِ الْجُبِّ (১২:১৫)-এর তাফসীরে।

হযরত খলীল আলায়হিস্ সালাম হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর কণ্ঠনালীর উপর ছুরি চালাতে উদ্যত হলেন। এখানো ছুরি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে চালিত হয়নি। ছুরি কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত জিব্রাঈল

সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা থেকে দুম্বাসহ হযরত খলীলের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলেন। ছুরি চালাতে দেননি কিংবা ছুরিকে কাটতে দেননি। হযরত সুলায়মানের উযির হযরত আসিফ ইবনে বরখিয়া চোখের একটি মাত্র পলক মারার পূর্বেই রাণী বিলক্বীসের তখত (সিংহাসন) ইয়ামন থেকে এনে সিরিয়ায় হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর দরবারে হাযির করে দিলেন। যার প্রমাণ ক্বোরআন মজীদে রয়েছে। তিনি (হযরত আসিফ) বলেছিলেন- اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ (অর্থাৎ আমি সেটা আপনার নিকট নিয়ে আসবো আপনার চোখের পলক আপনার দিকে (ফেরার পূর্বেই) [২৭:৪০]।

বুঝা গেলো যে, হযরত আসিফ জানতেন তখতটি কোথায়। গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা চাই যে, চোখের পলক মারার পূর্বে তিনি ইয়ামন গেছেন এবং ফিরেও এসেছেন। আর এত ওজনী তখতও নিয়ে এসেছেন।

বাকী রইলো এর আলোচনা যে, খোদ্ হযরত সুলায়মানের মধ্যে তখত নিয়ে আসার ক্ষমতা ছিলো কিনা? অবশ্যই ছিলো। এটা অবশ্য পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইন্‌শা-আল্লাহ্।

মি'রাজ শরীফে সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পেছনে নামায সম্পন্ন করেছেন। হুযূর তো বোরাক্বের উপর আরোহণ করে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। আর বোরাক্বের গতি এমন ছিলো যে, সেটার দৃষ্টির দিগন্তে সেটার কদম পড়তো। কিন্তু নবীগণের চলার গতির অবস্থা এ ছিলো যে, এক্ষুণি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে মুক্বতাদী ছিলেন। আর এক্ষুণি বিভিন্ন আসমানে পৌঁছে গেছেন। হুযূর এরশাদ করেন- আমি অমুক আসমানে অমুক নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিদ্যুৎগতির বোরাক্বও অধিকতর ধীরগতি সম্পন্ন ছিলো। কারণ দুল্‌হা ঘোড়ার উপর সাওয়ার হয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে। আর নবীগণের ছিলো খিদমত আন্‌জাম দেওয়ার সময়। এখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসে, এখন আসমানগুলোর উপর।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী তাঁর 'আশি'আতুল লুম'আত: কবর যিয়ারতের বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ের শেষভাগে বলেছেন, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মৃতদের রূহগুলো তাদের আপনজন ও নিকটাত্মীয়দের নিকট গিয়ে তাদের নিকট 'ঈসালে সাওয়াব' (সাওয়াব পৌঁছানো)'র আশা ব্যক্ত করে। এখন যদি কোন

মৃতের আপনজন ও নিকটাত্মীয়রা, অন্যান্য দেশে (বহুদূরে) অবস্থান করে তবে সেখানে পৌঁছে যাবে।

আমার এ আলোচনা থেকে একথা অতি উত্তমরূপে প্রতীয়মান হলো যে, সমগ্র বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা, সর্বত্র মুহূর্তের মধ্যে ভ্রমণ করে নেওয়া, এক মুহূর্তে কয়েক জায়গায় উপস্থিত থাকা ইত্যাদি হলো ওইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য, যেগুলো মহান রব আপন বান্দাদেরকে দান করেছেন।

এতে দু'টি কথা অনিবার্য হয়ে যায়- ১. কোন বান্দাকে 'হাযির-নাযির' বলে মানা শির্ক নয়। কারণ, শির্ক বলে আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী)তে অন্য কাউকে শরীক বলে মানা বা বিশ্বাস করা। এখানে এটা নেই এবং ২. হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর খাদিম (গোলাম)দের মধ্যেও যখন প্রতিটি স্থানে থাকার ক্ষমতা রয়েছে, তখন তো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মধ্যে এর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি রয়েছে।

দুই. দুনিয়ায় পানি ও শষ্য দানা সর্বত্র মওজূদ নেই; বরং বিশেষ বিশেষ স্থানেই রয়েছে। পানিতো কূপ, পুকুর এবং সমুদ্র ইত্যাদিতে থাকে, আর শষ্যদানা থাকে ক্ষেত ও ঘরগুলো ইত্যাদিতে। কিন্তু বাতাস, রোদ বিশ্বের কোণায় কোণায় মওজূদ থাকে। দার্শনিকদের মতে 'খালা' (خلاء) বা একেবারে ফাঁকা থাকা অসম্ভব। প্রতিটি স্থানে বাতাস আছে। এজন্য বাতাস ও আলো, সর্বদা সব বস্তুর জন্য অপরিহার্য। আর আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রয়োজন; যেমনটি আমি তাফসীর-ই রুহুল বয়ান ইত্যাদির বরাতে ইতোপূর্বে প্রমাণ করেছি। সুতরাং হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রতিটি স্থানে হাযির-নাযির থাকাও জরুরী।

তিন. হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হলেন সমগ্র বিশ্বের মূল। হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেন- وَكُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُوْرِىْ (আর সমস্ত সৃষ্টি আমার নূর থেকে সৃষ্ট)। সুতরাং মূল প্রতি শাখা-প্রশাখায়, শব্দের মূল তা থেকে নির্গত সমস্ত শব্দের মধ্যে এবং একক সমস্ত সংখ্যার মধ্যে থাকা জরুরী। কবি বলেন-

ہر ایک ان سے ہے وہ ہر ایک میں ہیں وہ ہیں ایک علم حساب
ہے دو جہاں کی وہ ہی بناء وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں

অর্থাৎ প্রত্যেকে তাঁর থেকে, তিনি প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছেন, তিনি আছেন- এ হিসাব-বিজ্ঞান অনুসারে। সুতরাং তিনি উভয় জাহানের ভিত্তি হলেন। এমন কেউ বা কিছু নেই, যিনি বা যা তার থেকে সৃষ্টি হয়নি।

---o---

দ্বিতীয় অধ্যায়

'হাযির-নাযির' বিষয়ক মাস্‌আলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও ওইগুলোর খণ্ডন

আপত্তি-১

প্রত্যেক স্থানে 'হাযির-নাযির' হওয়া আল্লাহ্ তা'আলারই গুণ। তিনি এরশাদ করেন- وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ (এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী অর্থাৎ হাযির-নাযির আছেন।) [সূরা বুরূজ: আয়াত-৯]

অন্য আয়াতে এরশাদ করেন- اَلاَ اِنَّه بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ (প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী) [সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত- ৫৪]

সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে এ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে বিশ্বাস করা 'শির্ক ফিস্ সিফাত' বা আল্লাহর গুণের মধ্যে শির্ক করা বৈ-কি?

খণ্ডন

প্রত্যেক জায়গায় হাযির-নাযির হওয়া আল্লাহ্‌র খাস বৈশিষ্ট্য মোটেই নয়; কারণ আল্লাহ্ স্থান থেকে পবিত্র। আক্বাইদের কিতাবাদিতে আছে- لاَ يَجْرِىْ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلاَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَكَانٌ অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র উপর না সময় অতিবাহিত হয়'। কারণ সময় নিম্নজগতে দেহগুলোর উপর যমীনে থাকাবস্থায় অতিবাহিত হয়; ওইগুলোরই বয়স হয়। সুতরাং চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি, হুর ও গিলমান এবং ফেরেশতারা, বরং আসমানের উপর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম, মি'রাজে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামও যমানা থেকে আলাদা। 'আর না কোন জায়গা আল্লাহকে পরিবেষ্টন করে'। আল্লাহ্ তা'আলা 'হাযির' কিন্তু কোন জায়গা

ব্যতিরেকে। এ কারণে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়। ৭:৫৪) আয়াতটিকে 'মুতাশা-বিহাত' (দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলো)-এর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আর بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ ইত্যাদি আয়াতগুলোতে তাফসীরকারকগণ বলেন, عِلْمًا وَ قُدْرَةً অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইল্‌ম এবং তাঁর ক্বুদরত গোটা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে।

আ'লা হযরতের ভাষায়-

وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے
وہی نبی ہیں جنکے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں

অর্থ: ওই নবী করীম লা-মকানে অবস্থান করেছেন, আরশের উপর তখতের উপর উপবিষ্ট হয়েছেন, ওই নবী হলেন তিনি, যাঁরই হচ্ছে এ মকান (স্থান)। আল্লাহ্‌ হলেন তিনিই, যার স্থান নেই (যিনি কোন স্থানে সঙ্কুলান হননা)।

সুতরাং এ অর্থে আল্লাহ্‌কে সব জায়গায় 'অবস্থানরত' বলে বিশ্বাস করা বে-দ্বীনী বা ধর্মহীনতাই। সর্বত্র উপস্থিত হওয়া তো আল্লাহ্‌র রসূলেরই শান (মর্যাদা)। এটা হুযূর-ই আক্‌রামের শান বলে মানলেও এ গুণ হুযূর আলায়হিস্‌ সালাম-এর জন্য খোদার দানই। এ নশ্বর সৃষ্টি আল্লাহরই ক্বুদরতের করায়ত্বে। আর আল্লাহর এ গুণ হচ্ছে ক্বদীম (অবিনশ্বর), কারো সৃষ্ট নয়, কারো করায়ত্বাধীন নয়। এতটুকু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শির্ক কিভাবে হয়? যেমন- حياة - سمع ও بصر (যথাক্রমে, জীবন, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি)। (এগুলোর আল্লাহর জন্য সত্তাগত আর আল্লাহর বান্দার জন্য তারই দানগত।)

'ফাতা-ওয়া-ই রশীদিয়া' ১ম খণ্ড: কিতাবুল বিদ্‌'আত: পৃ. নম্বর ৯১-এ আছে-

فخر دوعالم علیہ السلام کو مولود میں حاضر جاننا بھی غیر ثابت ہے -اگر باعلام اللہ تعالی جانتا ہے تو شرک نہیں- ورنہ شرک ہے یہی مضمون براہین قاطعہ صفحہ 23 میں ہے-

অর্থাৎ উভয় জাহানের গৌরব আলায়হিস্‌ সালামকে মীলাদ (মৌলূদ) শরীফে হাযির হন বলে জানাও প্রমাণিত নয়; যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে জানান বলে বিশ্বাস করা হয় তবে শির্ক নয়; অন্যথায় শির্ক। এ বিষয়বস্তুটি 'বারাহীন-ই ক্বা-ক্বি'আহ্‌'য় ২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দেখুন, মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব একেবারে রেজিষ্ট্রী করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে আল্লাহর দানক্রমে সর্বত্র হাযির-নাযির জানা শির্ক নয়। যদি কেউ বলে যে, এ থেকে একথা অনিবার্য হয়ে যায় যে, 'স্রষ্টা হওয়া' 'চিরস্থায়ী' এবং অবিনশ্বর ও অনাদি হওয়া ইত্যাদি আল্লাহর গুণাবলীও, পয়গাম্বরগণের জন্য আল্লাহর দানগত বলে মেনে নাও এবং হুযূর-ই আক্‌রামকে ও 'খালেক্ব' (স্রষ্টা), চিরজীবী ও ক্বাদীম বা অবিনশ্বর বলো। এর খণ্ডনে বলতে হবে যে, চারটি গুণ দান করার মতো নয়। কারণ সেগুলোর উপর 'উলূহিয়্যাৎ' (ইলাহ্‌ হওয়া)'র ভিত্তি স্থাপিত। ওইগুলো হচ্ছে- চিরজীবী হওয়া, অবিনশ্বর হওয়া, স্রষ্টা হওয়া ও মৃত্যুবরণ না করা। অন্য গুণাবলীর ঝলক আল্লাহর দানক্রমে মাখলুক্বদের মধ্যেও থাকতে পারে। যেমন- শ্রবণ, দেখা ও জীবন ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলোর মধ্যেও বড় পার্থক্য থাকবে। মহান রবের এ গুণাবলী যাতী (স্বত্তাগত), চিরস্থায়ী এবং নিশ্চিহ্ন হয় না এমন, আর মাখলূক্বের জন্য হবে 'আত্বাঈ' (আল্লাহর দানক্রমে), 'মুমকিন' (সম্ভাব্য) ও 'ফানী' (ধ্বংসশীল)।

কবির ভাষায়-

جو ہوتی خدائی بھی دینے کے قابل-خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا کا

অর্থাৎ যদি খোদায়ীও দেওয়ার উপযোগী হতো, তবে ওই খোদার বান্দাও খোদা বনে এসে যেতো।

আপত্তি-২

ক্বোরআন-ই করীমে এরশাদ হচ্ছে- وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ (তরজমা: হে হাবীব, আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা তাদের কলমগুলো পানিতে নিক্ষেপ করছিলো (লটারী দিচ্ছিলো)। [সূরা আল-ই ইমরান: আয়াত- ৪৪]

হযরত মরিয়মের অভিভাবকত্ব হাসিল কার জন্য যেই লটারী দেওয়া হয়েছিলো সে সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছে- وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের নিকট হাযির ছিলেন না যখন তারা তাদের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলো। (১২:১০২)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى অর্থাৎ আপনি তূরের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি হযরত মূসাকে রিসালতের হুকুম প্রেরণ করেছি। (২৮:৪৪)

আরো এরশাদ হয়েছে- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا অর্থাৎ আপনি তূর পর্বতের পাশে ছিলেন না, যখন আমি (হযরত মূসাকে) আহ্বান করেছি। (২৮:৪৬)

এ সব ক'টি আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিগত যুগে যখন উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটেছিলো, তখন তিনি সেখানে হাযির ছিলেন না। সুতরাং একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রত্যেক স্থানে 'হাযির-নাযির' নন।

খণ্ডন

এ প্রশ্ন বা আপত্তি এ জন্যই করা হলো যে, আপত্তিকারী 'হাযির-নাযির'-এর অর্থ সম্পর্কে অবগত নয়। আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি যে, 'হাযির-নাযির'-এ তিনটি পদ্ধতি রয়েছে-১. এক স্থানে রয়ে সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পাওয়া, ২. মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করা এবং ৩. এক সময় একাধিক জায়গায় উপস্থিত হতে পারা। উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি এ পবিত্র শরীরে ওইসব স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। ওইগুলোতে একথা কোথায় আছে যে, তিনি প্রত্যক্ষও করেননি? এ জড় দেহ সহকারে ওইসব স্থানে উপস্থিত না হওয়া এক জিনিষ, ওইসব ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করা অন্য জিনিষ; বরং উপরি উল্লিখিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ এ যে, হে মাহ্বূব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম! আপনি এসব স্থানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু এরপরও এসব ঘটনার জ্ঞান ও দর্শন অবশ্যই রয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আপনি সত্য নবী। এ আয়াতগুলোও হুযূর-ই আক্রাম হাযির-নাযির হওয়াকে প্রমাণ করছে।

'তাফসীর-ই সাভী'তে وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ الاية... -এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَهٰذَا بِالنَّظْرِ اِلَى الْعَالَمِ الْجِسْمَانِىِّ لِاِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَصْمِ وَاَمَّا بِالنَّظْرِ اِلَى الْعَالَمِ الرُّوْحَانِىِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُوْلٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ اِلَى اَنْ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ - (سورة قصص)

অর্থাৎ এ কথা এরশাদ হওয়া যে, 'আপনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর এ ঘটনার জায়গায় ছিলেন না', তা হচ্ছে শারীরিকভাবে উপস্থিতি অনুসারেই, তবে 'রূহানী বিশ্বের' অনুসারে হুযূর আলায়হিস্ সালাম প্রত্যেক রসূলের রিসালত এবং

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে আরম্ভ করে তাঁর এ শারীরিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া, হিজরতের দিনে সওর পর্বতের গুহায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বসহ উপস্থিত ছিলেন। ইত্যবসরে মক্কার কাফিরগণ গুহার দরজায় এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন হুযূর আলায়হিস্ সালাম বললেন- لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا (দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা, আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। (৯:৪০)

এটার মর্মার্থ কি এ-ই যে, আল্লাহ্ আমাদের সাথে তো আছেন, কিন্তু ওইসব কাফিরের সাথে নেই। সুতরাং আল্লাহ্ সর্বত্র নেই? কারণ কাফিরগণও তো 'বিশ্ব'-এর মধ্যে ছিলো! (এ মর্মার্থ মোটেই নয়।) অনুরূপ, হুযূর-ই আক্রাম ওইসব ঘটনায় এ দেহ মুবারকে উপস্থিত না থাকলেও রূহানীভাবে হাযির ছিলেন।

তাছাড়া, উহুদের যুদ্ধ সমাপ্ত করে কাফিরদেরকে সম্বোধন করে হুযূর-ই আক্রাম বলেছেন- اَللهُ مَوْلٰنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ (আল্লাহ্ আমাদের মুনিব, তোমাদের মুনিব কেউ নেই।) এখন যদি বলা হয় যে, এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র বাদশাহী ও শাসন-ক্ষমতা শুধু মুসলমানদের উপরই আছে, কাফিরদের উপর নেই। এ ধরনের আপত্তি দুরস্ত হবে না। কারণ মাওলা (مولٰى) মানে (وَالِى) (শাসক)। সুতরাং এর দু'টি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যেমন- প্রথম উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও বদান্যতা সহকারে আমাদের সাথে আছেন আর দাপট ও দমন সহকারে কাফিরদের সাথে আছেন। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে- সাহায্যকারী শাসক আমাদের সাথে আছেন। আর তোমাদের শাসকও তো আছেন, তবে তোমাদের জন্য সাহায্যকারী ও দয়ালু নন। এভাবে এ আয়াতগুলোর প্রসঙ্গেও বলা হবে- 'প্রকাশ্যভাবে, এ শরীর মুবারক সহকারে আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না।' (রূহানীভাবে ছিলেন।)

আপত্তি-৩

ক্বোরআন মজীদ এরশাদ করছে-

وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

অর্থাৎ কিছুসংখ্যক মদীনাবাসী, তাদের অভ্যাস হয়েছে মুনাফিক্বীর উপর। তাদেরকে আপনি জানেন না, আমি জানি। [সুরা তাওবা: আয়াত-১০১]

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রত্যেক স্থানে হাযির নন, অন্যথায় তিনি মুনাফিক্বদের অভ্যন্তরীণ রহস্যাবলীও জানতেন। অথচ, তিনি তাদের সম্পর্কে অবহিত নন।

খণ্ডন

উক্ত আয়াতে হুযূর-ই আক্রামের ইল্মকে অস্বীকার করা হয়নি; বরং ওই সব লোকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন কোন হাকিম (বিচারক) কোন অপরাধী সম্পর্কে নিজ বন্ধুকে বলেন, 'এ খবীস (অপবিত্র) সম্পর্কে তুমি জানোনা, তাকে তো আমিই জানি।' [তাফসীর-ই নুরুল ইরফান]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ (নিশ্চয় আপনি তাদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গিতে চিনে নেবেন। ৪৭:৩০)

ইমাম কালবী ও সুদ্দী বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক জুমু'আর দিনে খোৎবার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে মুনাফিক্বদের একেক জনের নাম ধরে এরশাদ করেন- 'বের হয়ে যাও হে অমুক, তুমি মুনাফিক্ব।' 'বের হয়ে যাও হে অমুক, তুমি মুনাফিক্ব।' তখন কয়েকজন মুনাফিক্বকে মসজিদ থেকে অপমানিত করে বের করে দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিক্বদের সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। [তাফসীর: খাযাইনুল ইরফান]

আপত্তি -৪

বোখারী শরীফ: কিতাবুত্ তাফসীর-এ আছে, হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, "সে লোকজনকে বলছে- لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ (মুসলমানদের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছুই দিওনা! (৬৩:৭)" আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই হুযূর-ই আক্রামের মহান দরবারে এসে মিথ্যা শপথ করে বললো, "আমি এটা বলিনি।" فَصَدَّقَهُمْ وَكَذَّبَنِىْ অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম তাকে সত্যবাদী বলে সাব্যস্ত করলেন আর আমাকে মিথ্যাবাদী।" যদি হুযূর-ই আক্রাম প্রত্যেক জায়গায় হাযির-নাযির হতেন, তবে ইবনে উবাইর পক্ষে ভুল সত্যায়ন কেন করলেন? আবার যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো তখন তিনি হযরত যায়দ ইবনে আরক্বামের সত্যায়ন করলেন এবং তাই সত্য হিসেবে প্রকাশ পেলো।

খণ্ডন

প্রাথমিক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর সত্যায়ন করলেও একথা অনিবার্য হয়না যে, হুযূর-ই আক্রামের নিকট প্রকৃত ঘটনার জ্ঞান ছিলোনা। বস্তুত: ওটা ছিলো আদালতে মুক্বাদ্দমার ঘটনার মতো। শরীয়ত মতেও মুকাদ্দমায় একথা জরুরী যে, হয়তো বাদী তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী পেশ করবে। অন্যথায় বিবাদী শপথ করে মুকাদ্দমা জিতে নেবে। কারণ ক্বাযীর মীমাংসা (রায়) বাদীর সাক্ষ্য, অন্যথায় বিবাদীর শপথ করার ভিত্তিতেই দেওয়া হয়; কাযীর নিজস্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় না। হযরত যায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন এ ঘটনার বাদী। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন যে, ইবনে উবাই হুযূর ও মুসলমানদের জন্য অপমানকর ভূমিকা পালন করেছে। আর বিবাদী ইবনে উবাই তা অস্বীকার করে শপথ করে ফেলেছিলো। যেহেতু তখন হযরত যায়দের নিকট সাক্ষী ছিলোনা, সেহেতু বিবাদী আবদুল্লাহ্র শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছিলো। এটা তো হুযূর-ই আক্রামের ন্যায় বিচারের বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর যখন ক্বোরআন মজীদ হযরত যায়দের পক্ষে সাক্ষী দিলো, তখন ওই সাক্ষ্যের কারণে তাঁর সত্যায়ন হলো। ক্বিয়ামতে পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিররা নবীগণের দ্বীন প্রচারের কথা অস্বীকার করবে। আর নবীগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন মর্মে দাবী করবেন। তখন মহান রাব্বুল আলামীন হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতদের থেকে নবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য নিয়ে নবীগণের সত্যায়ন করবেন। অনুরূপ, কাফিরগণ আরয করবে- وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আল্লাহরই শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।) তখন তাদের আমলনামা, ফেরেশতাগণ বরং তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো থেকে সাক্ষ্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হবে। (রায় দেওয়া হবে।) তাহলে কি মহান রবও প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জানেন না? অবশ্য জানেন। কিন্তু এটা কানুনেরই বাস্তবায়ন। সুতরাং এখানে كَذَّبَنِىْ মানে- 'তিনি আমার কথা মানলেন না।' এ অর্থ নয় যে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কেননা, মিথ্যাবাদী ফাসিক্ব হয়ে থাকে। অথচ সমস্ত সাহাবী 'আদিল' (মুত্তাক্বী ও মানবীয় সমস্ত গুণের ধারক)। কোন মুসলমানকে বিনা প্রমাণে ফাসিক্ব বলা যায়না।

কখনো কখনো দেওবন্দীরা বলে থাকে, নবী করীম কি নাপাক জায়গায় এবং দোযখেও হাযির? তাঁকে এমন জায়গায় হাযির বলে মেনে নেওয়া বেয়াদবীই।

তাদের জবাবে বলা যাবে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সর্বত্র হাযির থাকা তেমনি, যেমন সূর্যের রশ্মিগুলো ও চোখের আলো অথবা ফেরেশতাদের সর্বত্র মওজূদ থাকা। অর্থাৎ এসব জিনিষ অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন জায়গায়ও মওজূদ থাকে, কিন্তু এগুলো অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন হয় না। বলোতো, তোমরা মহান রবকেও ওইসব জায়গায় হাযির মানো কিনা? যদি মেনে থাকো, তাহলে তাঁর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন হলো কিনা? সূর্যের কিরণ নাপাক জায়গায় পড়লে সূর্য-নাপাক হয় না। সুতরাং 'হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়্যাহ', যাকে মহান রব 'নূর বলেছেন, সেটার উপর নাপাকী ইত্যাদির বিধান কেন জারী হবে?

আপত্তি-৫

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

لا يُبَلِّغُنِى اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحٰبِى شَيْئًا فَاِنِّى اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ -

অর্থাৎ কেউ আমার নিকট কোন সাহাবীর কথা পৌঁছাবে না, আমি চাই যে, আমি তোমাদের নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে আসবো।

যদি হুযূর-ই আক্রাম সর্বত্র হাযির-নাযির হতেন, তবে খবর পৌঁছানোর প্রয়োজন কি ছিলো? তাঁর তো এমনিতেই জানা থাকার কথা।

খণ্ডন

সম্মানিত নবীগণের 'ইলমে শুহূদী' (علم شهودى) বা 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান'-এ প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি জিনিষ থাকে; তবে প্রত্যেক জিনিষের উপর প্রতিটি সময়ে সেটার প্রতি মনযোগ থাকা জরুরী নয়। হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজির-ই মক্কীও এমনটি বলেছেন। এ উপরিউক্ত হাদীসের মর্মার্থ একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 'আমাকে লোকজনের কথাগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করিয়ে কারো দিক থেকে নারায করে দিওনা।' অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের আমি ছেড়ে দিই, তোমরাও ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকেও ছেড়ে দাও!)

আপত্তি -৬

বায়হাক্বী শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُه وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর আমার কবরের পাশে দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তা নিজ কানে শুনি। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে দুরূদ শরীফ প্রেরণ করে, আমাকে তা পৌঁছানো হয়।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, দূরের আওয়াজ তাঁর নিকট পৌঁছেনা। অন্যথায় 'পৌঁছানো' -এর কি প্রয়োজন?

খণ্ডন

এ হাদীস শরীফে কোথায় আছে যে, তিনি দূরের দুরূদ শরীফ শুনেন না? মর্মার্থ একেবারে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট যে, নিকটস্থদের দুরূদ শরীফতো শুধু নিজে শুনেন। আর দূরবর্তীদের দুরূদ শরীফ তিনি শুনেনও, তাঁর নিকট পৌঁছানোও হয়।

আমি 'হাযির-নাযির'-এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে 'দালা-ইলুল খায়রাত'-এর ওই বর্ণনা পেশ করেছি, যাতে হুযূর এরশাদ করেছেন যে, ভালবাসা সহকারে পঠিত দুরূদ শরীফ তো আমি নিজে শুনি, পক্ষান্তরে ভালবাসা শূন্যদের দুরূদ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং নিকটবর্তীর দুরূদ মানে 'আন্তরিক দুরূদ'। এ নৈকট্য আন্তরিক নৈকট্য অনুসারে, স্থানগত দূরত্ব অনুসারে নয়। যেমন কবি বলেন-

گر بے منی و پیش منی در یمنی - گر با منی و در یمنی پیش منی

অর্থাৎ হে ভালবাসাহীন লোক, যদিও তুমি আমার নিকটে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকো কিন্তু তুমি যেন আমার নিকট থেকে অনেক দূরে ইয়ামনে রয়েছো। পক্ষান্তরে, তুমি অন্তরের দিক দিয়ে আমার নিকটে থাকো; তাহলে তুমি ইয়ামনে থাকলেও আমার নিকটেই আছো।

পৌঁছানো হলে একথা অনিবার্য হয় না যে, তিনি তা শুনেনই না। অন্যথায়, ফেরেশতারাও বান্দাদের আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। এটাও কি এজন্য যে, আল্লাহ্ শুনে না, জানে না? মোটেই নয়। দুরূদ শরীফও পৌঁছানোর মধ্যে বান্দাদের ইজ্জত প্রদর্শনের প্রমাণ রয়েছে, অর্থাৎ দুরূদে পাকের বরকতে তাদের এ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে- গোলামদের নাম শাহানশাহে আলমের দরবারে এসে যায়। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ফক্বীহগণ বলেন, নবীর অবমাননাকারীদের তাওবা কবূল হয়না। দেখুন 'ফাতাওয়া-ই শামী: বাবুল মুর্তাদ্দ'। কেননা, এ অবমাননা প্রদর্শনের ফলে তাঁদের হক্ব' বিনষ্ট হয়। বান্দার হক্ব তাওবার ফলেও মাফ হয় না। যদি তাদের মানহানি করার খবর হুযূরের না থাকতো, তাহলে এটা 'বান্দার হক্ব' কীভাবে

হলো? 'গীবত' তখনই 'বান্দার হক্ব' হয়, যখন সেটার খবর তার নিকট পৌঁছে যায়, যার গীবত করা হয়েছে। অন্যথায় তা 'আল্লাহ্‌র হক্ব' থাকে। দেখুন- 'শরহে ফিক্বহে আকবার', কৃত. মোল্লা আলী ক্বারী। ইবনে তাইমিয়ার শীষ্য ইবনে ক্বাইয়্যেম কৃত 'জালাউল আফহাম': ৭৩ পৃষ্ঠায়ও একথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে-

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُّصَلِّىْ عَلَىَّ اِلاَّ بَلَغَنِىْ صَوْتُه حَيْثُ كَانَ قُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِىْ

অর্থাৎ কেউ যে কোন স্থান থেকে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ুক, আমার নিকট সেটার আওয়াজ পৌঁছে যায়। আমরা বললাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, এটা কি আপনার ওফাৎ শরীফের পরও অব্যাহত থাকবে?" তিনি এরশাদ করলেন, "আমার ওফাতের পরও এটা বহাল থাকবে।"

[জালাউল আফহাম: পৃ. ৭৩, ইদারাতুত্ ত্বাবা'আতিল মুনী-রিয়াহ্ কর্তৃক মুদ্রিত]

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী কৃত, 'আনীসুল জালীস': পৃ. ২২২-এ উল্লেখ করা হয়েছে- হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন-

اَصْحَابِىْ اِخْوَانِىْ صَلُّوْا عَلَىَّ فِىْ كُلِّ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بَعْدَ وَفَاتِىْ فَاِنِّىْ اَسْمَعُ صَلٰوتَكُمْ بِلاَ وَاسِطَةٍ

অর্থাৎ প্রত্যেক জুমু'আহ্‌বার ও সোমবার আমার উপর দুরূদ বেশী পরিমাণে পড়ো, আমার ওফাতের পর। কেননা, আমি তোমাদের দুরূদ কোন মাধ্যম ছাড়াই শুনে থাকি।

আপত্তি-৭

'ফাতা-ওয়া-ই বায্‌যাযিয়াহ্'য় আছে-

مَنْ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ يُكْفَرُ

অর্থাৎ যে বলে, 'পীর-মাশা-ইখের রূহগুলো হাযির আছে, জানে' সে কাফির। শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব 'তাফসীর-ই ফাত্হুল আযীয'-এর ৫৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

انبیاء ومرسلین را لوازم الوہیت از علم غیب وشنیدن فریاد ہر کس در ہر جا وقدرت بر جمیع مقدورات ثابت کنند۔

অর্থাৎ "নবী ও পয়গাম্বরগণের জন্য খোদায়ী গুণাবলী, যেমন ইলমে গায়ব এবং প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রত্যেক লোকের ফরিয়াদ শোনা এবং প্রত্যেক 'মুমকিন'

(সৃষ্টি)'র উপর ক্ষমতা প্রয়োগ বলে প্রমাণ করে।" এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইলমে গায়ব ও প্রত্যেক জায়গায় হাযির-নাযির হওয়া খোদা তা'আলারই গুণ; অন্য কারো জন্য মেনে নেওয়া সুস্পষ্ট কুফর। বায্‌যাযিয়াহ্ ফিক্বহ্ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব। আর এটা কুফরের হুকুম দিচ্ছে।

খণ্ডন

'ফাতাওয়া-ই বায্‌যাযিয়াহ্'র প্রকাশ্য বচনের পাকড়াওয়ে তো বিরুদ্ধবাদীরাও এসে যায়। কারণ-

প্রথমত এজন্য যে, আমি 'ইমদাদুস্ সুলূক', কৃত. মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহীর বচন পেশ করেছি, যাতে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শায়খের রূহকে মুরীদদের নিকট হাযির বলে জানার শিক্ষা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত এ জন্য যে, 'বায্‌যাযিয়া'র ইবারতে একথার স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, কোন্ জায়গায় মাশা-ইখের রূহকে হাযির জানবে; প্রত্যেক জায়গায়, না কোন কোন জায়গায়? এ শর্তহীন বর্ণনা থেকে তো একথা বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কেউ মাশা-ইখের রূহকে একটি মাত্র স্থানেও হাযির জানে অথবা একটি মাত্র কথা সম্পর্কে জানেন মর্মে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির। এখন দেখুন, বিরুদ্ধবাদীরাও মাশা-ইখের রূহকে তাঁদের কবর কিংবা 'ইল্লিয়্যীন'-এর স্থানে এবং বরযখ ইত্যাদিতে, যেখানে সেটা থাকে, সেখানে তো হাযির বলে জানবেনই। সুতরাং যেকোন স্থানেই এমনটি মানলেই কুফর হবে।

তৃতীয়ত এ জন্য যে, আমি 'হাযির-নাযির' -এর আলোচনায় 'ফাতাওয়া-ই শামী'র ইবারত পেশ করেছি। তাহচ্ছে يَا حَاضِرُ يَا نَاظِرُ (হে হাযির, হে নাযির) বলা কুফর নয়।

চতুর্থত এ জন্য যে, আমি 'আশি'আতুল লুম্'আত ও 'ইহ্ইয়াউল উলূম', বরং নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী ওহাবীর ইবারত বর্ণনা করেছি, যাতে তিনি বলেন, নামাযী তার হৃদয়ে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে 'হাযির' জেনে 'আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু' বলবে। এখন ফিক্বহ্ শাস্ত্রের ওইসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপর বায্‌যাযিয়াহ্‌র ফাত্ওয়া জারী হবে কিনা? সুতরাং একথা মানতে হবে যে, 'বায্‌যাযিয়াহ্'য় যে 'হাযির-নাযির' মানাকে কুফর বলা হচ্ছে তা হচ্ছে ওই 'হাযির-নাযর' হওয়া, যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ; অর্থাৎ যাতী, ক্বাদীম, ওয়াজিব, (যথাক্রমে, স্বত্তাগত, অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ীভাবে অনিবার্য)। অর্থাৎ 'কোন স্থানে সশরীরে উপস্থিত না র'য়ে হাযির থাকা'। এমন

'হাযির থাকা' মহান রবেরই গুণ। তিনি তো সর্বত্র আছেন, তবে কোন জায়গায় নন; অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও ক্বুদ্‌রত সর্বত্র বিরাজমান।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি 'ফাতাওয়া-ই রশীদিয়া' নামক কিতাবের প্রথম খণ্ড: কিতাবুল বিদ্‌'আত: ৯১নং পৃষ্ঠার ইবারত এবং 'বারাহীন-ই ক্বাত্বি'আহ্‌'র ২৩ নং পৃষ্ঠার ইবারত উদ্ধৃত করেছি, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৌলভী রশীদ আহমদ ও মৌলভী খলীল আহমদ সাহেবানও এ ফাত্‌ওয়ায় আমাদের পক্ষে আছেন।
হযরত শাহ্‌ আবদুল আযীযের ইবারত একেবারে স্পষ্ট- এ মর্মে যে, মাশা-ইখ ও নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালাম-এর ক্ষমতাকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌র মত বিশ্বাস করা কুফর। অন্যথায় খোদ্‌ শাহ্‌ আবদুল আযীয সাহেব وَيَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-এর তাফসীরে হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে 'হাযির-নাযির' মেনেছেন।

আপত্তি-৮

[উল্লেখ্য, কোন কোন বিরুদ্ধবাদী যখন কোন রাস্তা পায়না, তখন বলে ফেলে, 'আমরা ইবলীসের মধ্যে সব জায়গায় পৌঁছে যাবার ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করি। অনুরূপ, আসিফ ইবনে বরখিয়া, মালাকুল মাওত এবং অন্যান্য ফেরেশতার মধ্যে এ ক্ষমতা রয়েছে বলে মেনে নিই, কিন্তু এটা মানিনা যে, অন্য সৃষ্টির পূর্ণতাসমূহ পয়গম্বরদের মধ্যে অথবা হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।]
মৌলভী ক্বাসেম সাহেব নানূতভী তার 'তাহ্‌যীরুন্নাস'-এ লিখেছেন,"বাকী রইলো আমল। এ'তে অনেক সময় নবী নয় এমন লোকও নবী অপেক্ষা বেড়ে যায়।"
'রুজূমুল মুযনিবীন'-এ মৌলভী হোসাঈন আহমদ সাহেব লিখেছেন, "দেখুন, 'বিলক্বীসের সিংহাসন' নিয়ে আসার ক্ষমতা হযরত সুলায়মানের মধ্যে ছিলোনা, কিন্তু আসিফের মধ্যে ছিলো। অন্যথায় তিনি নিজে কেন নিয়ে এলেন না? অনুরূপ, হুদ্‌হুদ বলেছে- اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ (অর্থাৎ হে হযরত সুলায়মান, আমি ওই বিষয় জেনে এসেছি, যার সম্পর্কে আপনার অবগতি নেই। (২৭:২২) তাছাড়া, হুদহুদের চক্ষুযুগল মাটির নিচের পানি দেখে নেয়। এ কারণে সেটা হযরত সুলায়মানের দরবারে থাকতো, যেন মরুভূমি বা জঙ্গলে মাটির নিচের পানির সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু হযরত সুলায়মান সে সম্পর্কে জানতেন না।

বুঝা গেলো যে, নবীগণের জ্ঞান ও শক্তি অপেক্ষা নবী নয় এমন মানুষ বরং পশু-পাখীর জ্ঞান ও ক্ষমতা বেশী হতে পারে।

খণ্ডন

নবী নয় এমন কারো মধ্যে নবী অপেক্ষা বেশী অথবা অন্য কোন নবীর মধ্যে হুযূর-ই আক্‌রাম আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর চেয়ে বেশী পূর্ণতা রয়েছে মর্মে বিশ্বাস করা ক্বোরআনের স্পষ্টার্থক আয়াত শরীফ, বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহ ও ইজমা'ই উম্মতের পরিপন্থী। স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীরাও একথা মেনে নেয়। তাদের উক্তি ও মন্তব্যগুলো আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।
এ অষ্টম আপত্তি, আপত্তিকারীদের স্বয়ং নিজেদের মাযহাব ছেড়ে দেওয়া (ধর্ম ত্যাগ করা)'রই নামান্তর।
শেফা শরীফে আছে- যদি কেউ বলে, 'অমুকের ইল্‌ম (জ্ঞান) হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম অপেক্ষা বেশী' সে কাফির। কোন পূর্ণতা বা গুণেই কাউকে হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম-এর চেয়ে বড়তর মানা কুফর। নবী নয় এমন কেউই নবীর চেয়ে না ইল্‌ম বা জ্ঞানে বেশী হতে পারে, না আমলের ক্ষেত্রে। যদি কারো বয়স ৮০০ (আটশ') বছর হয়, আর সে যদি এ পূর্ণ সময়সীমায় শুধু ইবাদতই করে, আর বলে, "আমার ইবাদত তো আটশ' বছর ব্যাপী, কিন্তু হুযূর আলায়হিস্‌ সালাম-এর ইবাদত সর্বমোট পঁচিশ বছর সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং আমি হুযূর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম থেকে বেড়ে গেছি", সে বে-দ্বীন। বস্তুত কারো একটি মাত্র সাজদার সাওয়াব আমাদের লাখো বছরের ইবাদত অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। শুধু এতটুকু হয়েছে যে, কারো পরিশ্রম বেশী হতে পারে; কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য, মর্যাদা ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে নবীর সাথে তার তুলনাই হয়না। নবীর শানতো অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।
'মিশকাত শরীফ: বাবু ফাদ্বা-ইলিস্‌ সাহাবাহ্‌'য় আছে- হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীর স্বল্প পরিমাণে যব খায়রাত করা তোমাদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ খয়রাত করার চেয়েও উত্তম।" বনী ইসরাঈলের শাম'উন এক হাজার মাস যাবৎ অর্থাৎ ৮৩ বছর চার মাস নিয়মিতভাবে ইবাদত করেছে। এ জন্য মুসলমানগণ ঈর্ষা (ভাল অর্থে) করলেন আর বললেন, "আমরা তার মর্যাদা কীভাবে লাভ করবো?" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো- لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ শবে ক্বদর হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। (সূরা ক্বাদর) অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকে একটি শবে ক্বদর দিচ্ছি। ওই রাতে

ইবাদত করা বণী ইসরাঈলের হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একেক মুহূর্ত লাখো শবে ক্বদর অপেক্ষা উত্তম। যে মসজিদ শরীফের এক কোণায় নবীকুল সরদার আরাম ফরমাচ্ছেন, অর্থাৎ মসজিদ-ই নবভী শরীফ, সেখানকার এক রাক'আত পঞ্চাশ হাজারের সমান সাওয়াবের মর্যাদা রাখে। যাঁর নিকটে আমাদের ইবাদত এতবেশী ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়, তাঁর ইবাদতের অবস্থা কেমন হবে তা আর বলার অবকাশ রাখেনা।

অনুরূপ, এ কথা বলা যে, আসিফ ইবনে বরখিয়ার মধ্যেই তখ্ত আনার ক্ষমতা ছিলো, হযরত সুলায়মানের মধ্যে ছিলোনা, অনর্থক প্রলাপ বকা বৈ আর কি হতে পারে? ক্বোরআন মজীদ এরশাদ ফরমাচ্ছে-

وَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَه عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

(অর্থাৎ সে-ই বলেছে, যার নিকট কিতাবের ইল্ম ছিলো, আমি বিলক্বীসের ওই তখ্ত আপনার চোখের পলক মারার পূর্বে আপনার দরবারে হাযির করবো। (২৭:৪০) বুঝা গেলো যে, আসিফের এ ক্বুদ্রত কিতাবের ইল্ম থাকার কারণেই ছিলো।

কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলছেন, "তাঁকে 'ইস্মে আ'যম' দিয়েছিলেন, যার ক্ষমতায় তিনি এ তখ্ত এনে দিয়েছেন। তিনি এ ইল্ম হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর বরকতে লাভ করেছেন। এরপর এ কথা কীভাবে হতে পারে যে, তাঁর মধ্যে এ ক্ষমতা ছিলো; কিন্তু তাঁর ওস্তাদ সাইয়্যেদুনা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যে ছিলোনা?

বাকী রইলো, তিনি নিজে কেন আনলেন না? কারণও একেবারে স্পষ্ট। তা হচ্ছে- কাজ করা তো খাদিমদের দায়িত্ব, রাজা বাদশাহ্র নয়। বাদশাহীর শান-শওকত চায় খাদিমদের মাধ্যমে কাজ করানো। বাদশাহ্ তাঁর নওকর-চাকর দ্বারা পানি তলব করে পান করেন। এটাকি এজন্য যে, তার মধ্যে পানি নেওয়ার শক্তি নেই? মোটেই নয়। বিশ্ব জগতের মহান রব দুনিয়ার সমস্ত কাজ ফেরেশতাদের মাধ্যমে করান। যেমন- বৃষ্টি বর্ষণ করানো, প্রাণ কব্জ করানো, গর্ভাশয়ে শিশুর গড়ন তৈরী করা- এ সবই তো ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এসবের ক্ষমতা নেই বলে এমনিট করা হয়েছে? ফেরেশতাগণ কি আল্লাহ্ তা'আলার চেয়ে বেশি শক্তিশালী? মোটেই না।

'তাফসীর-ই রুহুল বয়ান' আয়াত فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (৫ম পারা: সূরা নিসা: আয়াত-৯২)-এ বলেছেন, হযরত সুলায়মান আসিফকে বিলক্বীসের তখ্ত আনার হুকুম এ জন্য দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে তাঁর মর্যাদা থেকে নামতে চাননি। অর্থাৎ এ কাজ তো খাদিমদের। অনুরূপ, হুদহুদের উক্তি পবিত্র ক্বোরআন উদ্ধৃত করেছে। সেটা বলেছিলো, "আমি ওই জিনিষ দেখে এসেছি, যার খবর আপনার নিকট নেই।" ক্বোরআন কোথায় বলেছে, "বাস্তবিক পক্ষেও তাঁর জানা ছিলোনা?"

হুদহুদ মনে করেছিলো, হয়তো এর খবর হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট ছিলোনা। তাই সেটা এমনটিতে বলে ফেলেছিলো। সুতরাং এ থেকে সনদ বা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারেনা।

তাছাড়া, হুদহুদ আরয করেছিলো- اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِه (আমি ওই বিষয় দেখে এসেছি, যা আপনি দেখেননি। (২৭:২২) অর্থাৎ ওই দেশে আপনি এ চোখে দেখার জন্য যাননি। 'খবর থাকা'র কথা অস্বীকার করেনি। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট এ সবকিছুর খবর ছিলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এ ছিলো যে, এত বড় কাজ একটি হুদহুদ পাখীর মাধ্যমে সম্পন্ন হোক; যাতে বুঝা যায় যে, পয়গাম্বরের নিকট উপবেশনকারী পশু-পাখীও ওই কাজ করে দেখাতে পারে, যা অন্য মানুষের দ্বারাও সম্ভব হয় না। যদি হযরত সুলায়মানের সে সম্পর্কে খবর না থাকতো, তাহলে আসিফ ইবনে বরখিয়া কারো নিকট থেকে ঠিকানা জেনে না নিয়ে ইয়ামনের সাবা শহরে বিলক্বীসের ঘরে কিভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন? আর মুহূর্তের মধ্যে তখ্তটা কিভাবে নিয়ে আসলেন? বুঝা গেলো যে, সমগ্র ইয়ামন রাজ্য হযরত আসিফের সামনে ছিলো। সুতরাং সেটা সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট কীভাবে গোপন থাকতে পারে?

হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামেরও তাঁর পিতার ঠিকানা জানা ছিলো; কিন্তু সময় আসার পূর্বে নিজের খবর দেননি; যাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিক এবং তাঁর শান (মর্যাদা) সম্পর্কে সারা দুনিয়া জানুক, তারপর পিতার সাথে সাক্ষাৎ হোক।

তাছাড়া ভূ-গর্ভের পানি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার খিদমতটি হুদহুদকে অর্পণ করা হয়েছিলো। রাজা-বাদশাহগণ এসব কাজ নিজে করেন না।

মসনভী শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে- একদা হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করছিলেন। মোজা শরীফ খুলে রেখে দিলেন। একটা চিল এসে একটি মোজা ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো এবং

(আকাশের) উপর নিয়ে গিয়ে সেটাকে উল্টো করে নিচের দিকে ছেড়ে দিলো, যা থেকে একটা সাপ বের হলো। হুযূর আলায়হিস্ সালাম চিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমার মোজা কেন ছোঁ মেরে নিয়ে গেছো?" সেটা আরয করলো, "আমি উড়তে উড়তে যখন আপনার শির মুবারকের বরবার আসলাম, তখন আপনার শির মুবারক থেকে আসমান পর্যন্ত নূর ছিলো। সেটার মধ্যে এসে আমার সামনে যমীনের সাত স্তর স্পষ্ট হয়ে গেলো। এর ফলে আমি আপনার মোজা শরীফের ভিতর সাপ দেখতে পেলাম। সুতরাং আমি একথা খেয়াল করে সেটা তুলে নিলাম যে, হয়তো আপনি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করেই সেটা পড়ে ফেলবেন এবং আপনি কষ্ট পাবেন।"

মাওলানা রুম বলেছেন-

ملا در موزہ بہ بینم در ہوا-نیست از من عکس تست اے مصطفے

অর্থাৎ সাপ বললো, আমি বাতাসে উড়ন্ত অবস্থায় মোজা শরীফের ভিতর সাপ দেখতে পেলাম। আলোর এ পতিবিম্ব, হে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম, আমার থেকে বিচ্ছুরিত হয়নি; বরং সেটা আপনার যাত মুবারক থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছিলো। অতঃপর হুযূর-ই আক্রাম বললেন-

گرچہ ہر غیبے خدا مارا نمود - دل دریں لحظہ بحق مشغول بود

عکس نور حق ہمہ نوری بود-عکس دور از حق ہمہ دوری بود

অর্থাৎ ১. যদিও আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রতিটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দিয়েছেন, তবুও ওই মুহূর্তে আমার হৃদয় আল্লাহর ধ্যানে মশগুল ছিলো।

২. আল্লাহর নূরের প্রতিবিম্বে সব কিছু নূরী হয়ে গিয়েছিলো। দূরের প্রতিবিম্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব কিছু দূরেই ছিলো।

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একদা আরয করেছিলেন, "হে আল্লাহর হাবীব! আজ খুব ভারী বর্ষণ হয়েছে। আর আপনি কবরস্থানে ছিলেন। আপনার কাপড় ভিজেনি কেন?" হুযূর এরশাদ করলেন, "আয়েশা, তুমি কী কাপড় জড়িয়েছো?" আরয করলেন, "আপনার তহবন্দ (পরনের চাদর) শরীফ।

আল্লামা রূমী বলেন-

گفت بہر آں نمودائے پاک حبیب - چشم پاکت را خدا یاران غیب

نیست ایں باراں ازیں ابر شما - ہست باران دیگرودیگر سما

অর্থাৎ হে মাহবূবা! তহবন্দ শরীফের বরকতে তোমার চক্ষুযুগল থেকে অদৃশ্যের পর্দা উঠে গেছে। এ বৃষ্টি ছিলো নূর; পানির বৃষ্টি ছিলোনা। এর মেঘ ও আসমানই ছিলো ভিন্নতর। হে আয়েশা এটা কারো দৃষ্টিগোচর হয়না, তুমি আমার তহবন্দের বরকতে সেটা দেখে ফেলেছো।

হুদহুদের চক্ষুযুগলে এ ক্ষমতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের জন্য জ্বালানো আগুনে পানি ছিটানোর বরকতে অর্জিত হয়েছিলো এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সঙ্গ লাভের কারণে।

আপত্তি -৯

যদি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম প্রত্যেক জায়গায় হাযির-নাযির হতেন, তবে আমাদের মদীনা-ই পাকে হাযির হবার কী প্রয়োজন ছিলো?

খণ্ডন

যখন খোদা তা'আলা সর্বত্র হাযির-নাযির আছেন, তখন কা'বা শরীফে যাবার প্রয়োজন কী? আর মি'রাজে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর আরশে যাওয়ায়ও কী লাভ ছিলো?

জনাব, মদীনা মুনাওয়ারাহ্ হচ্ছে রাজধানী এবং তাজাল্লী প্রতিফলনের খাস জায়গা। যেমন, বিদ্যুৎ শক্তির জন্য সেটার পাওয়ার হাউজ; বরং আল্লাহর ওলীগণের কবর (মাযার) শরীফগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পাওয়ারের একেকটি বাল্ব। সেগুলোর যিয়ারত (সাক্ষাৎ) করাও জরুরী।

পরিশেষে, এ পুস্তকে আলোচ্য বিষয়টির উপর বিস্তারিত সপ্রমাণ আলোচনার পর এ সম্পর্কে কারো মনে কোনরূপ সংশয় থাকার কারণ থাকতে পারে না। আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁরই মাধ্যমে অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম, ফিরিশ্তাগণ ও আল্লাহর ওলীগণকে 'হাযির-নাযির'রূপী যে মহান গুণটিও দান করেছেন তা সম্পর্কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেও আর কোন দ্বিধা থাকছেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه تعالى
على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين

---সমাপ্ত---